লোকারণ্য

লোকারণ্য

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীআশুতোষ ঘোষ
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

—আড়াই টাকা—

১৩৪৬

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাঙ্গালার তরুণ তরুণীদের
হাতে দিলাম

গ্রন্থকারের অন্যান্য উপন্যাস

অনাগত—১॥০

ভ্রষ্টলগ্ন—১৷৹

বিদ্যুৎলেখা—২৲

কলিকাতার বিখ্যাত উকীল গণপতি রুদ্রের বাড়ী। বাড়ীখানি আধুনিক ধরণে সুসজ্জিত,—গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্য ও সুরুচির চিহ্ন সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

গোধুলির সোণালী আভা পশ্চিম আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে, গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৃহের একটী ঘরে দুইটী তরুণী বসিয়া কথা বলিতেছিল। একজন গণপতির কন্যা সবিতা, আর একজন তাহার বন্ধু মাধুরী।

—কি ভাগ্য! আজ সত্যই আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন,—নইলে, তোর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, এ আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলুন—

সবিতার পদ্মকোরক তুল্য একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, তাহাতে মৃদু চাপ দিয়া মাধুরী বলিল—কিন্তু আমি আশা ছাড়িনি, জানতুম তোর সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই! এ পাঁচ বৎসর তো কলকাতায় ছিলাম না! এখানে এসেই তোর খোজ করেছি,—ফলে আজ এই শুভযোগ।

—পাঁচ বৎসর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলি তুই? সেই যে কলেজ ছেড়ে দিলি—শুনলাম তোর একটা খুব ভাল বিয়ে হয়েছে;—বিয়ের আগে বরের সঙ্গে প্রেমেও নাকি পড়েছিলি,—এদেশের মেয়েদের অদৃষ্টে যা প্রায়ই ঘটে না!

মাধুরীর মুখের উপর ঈষৎ রক্তিম আভা খেলিয়া গেল। কয়েক গুচ্ছ অবাধ্য অলক চম্পক কলির মত, অঙ্গুলি দিয়া ললাট হইতে সরাইতে সরাইতে সে কহিল,—তেমন অদৃষ্ট তোরও একদিন হয়ত হবে, সেজন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিস্‌নে! তবে যে সে লোককে তোর তো আর পছন্দ হবে না!—তোর বর আসবে কোন্ "অচিন দেশের রাজপুত্র" —সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে,—পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে—

সবিতা বাধা দিয়া বলিল—থাম থাম, ঢের হয়েছে, এখন তোর নিজের কথা বল্ শুনি—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে মাধুরী বলিল—পাঁচ বৎসরের ইতিহাস শুনে তোর কোন লাভ নেই, সবিতা,—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মত আমার জীবনের এ অংশ অজ্ঞাতই থাক—!

সবিতার মনে হইল, মাধুরীর কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ বিষাদের সুর বাজিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি তোর গুপ্তকথা শুন্‌তে চাইনে! কিন্তু সত্য করে বল্ দেখি, বিয়ে করে' তুই সুখী হয়েছিস্ কিনা?

মাধুরীর অধরে প্রসন্ন হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া সে বলিল,—খুব সুখী হয়েছি ভাই, —এত সুখ জীবনে আর কোন দিন পাই নি!—

—সত্য বল্‌ছিস্? কিন্তু আমি জানতুম, তুই তেজী মেয়ে, —তোর জীবনের আদর্শ আর দশজন সাধারণ মেয়ের মত

নয়। তুই-ই না বলেছিলি একদিন—এই দুর্ব্বলপ্রকৃতি ভীরু পুরুষগুলোকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিস্ নে,—যাকে তাকে স্বামী বলে মেনে নিয়ে তার চরণ পূজা করাও তোর দ্বারা হবে না—! আর আজ কোন মন্ত্র বলে, তোর মতামত সব উল্‌টে গেল— ?

একটু থামিয়া পুনরায় কহিল—নিশ্চয়ই মনের মত স্বামী পেয়েছিস! তোর স্বামী খুব বড়লোক—আর বিদ্বান্ নয় ?

মাধুরীর মুখে কৌতুকহাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সবিতার কাঁধের উপর এক হাত রাখিয়া সে বলিল—ঈর্ষা করবার মত কিছুই নাই ভাই! না আছে একখানা মোটর গাড়ী, না আছে বালিগঞ্জে একটা বাড়ী; গরমের সময় সিমলায় বা শরৎকালে ওয়ালটেয়ারে যাবার পয়সাও নাই! আর বিদ্যার কথা বল্‌ছিস্! তিনি বলেন, সিনেট হলের বড় বড় সিঁড়িগুলা বেয়ে উঠতেই তাঁর পা কাঁপে। আমি তো বরং হলটায় দু একবার বসেছিলুম,—তাঁর অদৃষ্টে তাও ঘটে নি—

বলিয়া মাধুরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাধুরীর হাসিতে সবিতা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মাধুরী পুনরায় কহিল—ভাবছিস্—আমার স্বামীটী তাহ'লে না জানি কি অসামান্য জীব! কতকটা অসামান্যই বটে,—তিনি বসে বসে কাব্য লেখেন, আর আমি শুনি! কেমন চমৎকার ব্যবস্থা, নয়?—

সবিতা এতক্ষণে অকুল সমুদ্রে যেন কুলের রেখা দেখিতে পাইল। সোৎসাহে কহিল—ও তিনি একজন কবি—

আর্টিষ্ট! খুব নামজাদা কবি নিশ্চয়ই! কি নাম বল্‌ত, ভাই—

মাধুরী হাসিতে হাসিতে বলিল—দূর—দূর, হিন্দুর মেয়ে কি স্বামীর নাম মুখে আনে—!

বলিয়া সকৌতুকে সবিতার কাণের কাছে মুখ লইয়া গেল।

সবিতাও হাসিয়া উঠিয়া কহিল—ও, কবি অতুল রায়! তাঁর নাম তো খুবই শুনেছি, সব বড় বড় মাসিকেই তাঁর কবিতা ছাপা হয়। তাছাড়া, সেদিন "শুকতারা" নামে তাঁর যে নূতন উপন্যাসখানা বেরিয়েছে—সে একেবারে অপূর্ব্ব! বাবাকে পড়ে শোনাচ্ছিলুম,—তিনি বললেন, আনাতোল ফ্রান্স বা হল কেনের উপন্যাসের পাশে স্থান পাবার যোগ্য!

মাধুরীর মুখের উপর একটা গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দের ছাপ পড়িল, সবিতার দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া মাধুরী ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিল—

—কিন্তু ওই পর্য্যন্ত, ওই নামটুকুই সার! বইগুলো পোকায় কাটে, লেখবার কালির দামও উঠে না। আশ্চর্য্য এই যে, সমাজ অন্য সব জিনিষের জন্যই দাম দিতে প্রস্তুত, কেবল রস ও আনন্দই তারা বিনামূল্যে পেতে চায়। অথচ ও-জিনিষ না হ'লে কোন সমাজই নাকি বেঁচে থাক্‌তে পারে না—ওই নাকি সভ্যতার মাপকাঠি!

সবিতা চিন্তিতভাবে কহিল—বুঝেছি, কবির গৃহিনী হয়ে, লক্ষ্মীর কৃপা তুই লাভ করতে পারিস্ নি—

—তার জন্য আমি দুঃখ করিনে ভাই, কমলার অনুগ্রহের প্রলোভন তো আমি ইচ্ছে করেই ত্যাগ করেছিলুম—

বলিয়া মাধুরী ম্লানভাবে একটুখানি হাসিল।

সবিতা কিছুক্ষণ মাধুরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে পরম স্নেহভরে তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—আমার কাছে লুকোস নে, মাধুরী! জীবন তোর সুখের নয়, কোন গভীর দুঃখ তোর মনে আছে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোর সেই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ম্লান, চোখের কোণে ঈষৎ কালো রেখা—

—হয়েছে, হয়েছে! মুখে উদাস ভাব, নয়নে ক্লান্ত দৃষ্টি! তুইও যে মস্ত বড় একজন কবি হয়ে উঠ্‌লি, ওঁর সঙ্গে তোর বেশ মিল আছে—

সবিতা হাসিয়া কহিল—সত্যি তোর কবিটির সঙ্গে আমার একদিন পরিচয় করে' দে! এমন একজন জিনিয়াসের সঙ্গে আলাপ হওয়াটা সৌভাগ্যের কথা!

মাধুরীর মুখে ক্ষণিকের জন্য ম্লান ছায়া পড়িল, পরক্ষণেই অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সে বলিল—সৌভাগ্য তোর না তাঁর! এমন একজন সুন্দরী বিদুষীর সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য জীবনে বোধ হয় তাঁর হয় নি!

কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া সবিতা বলিল—নিতাই তো হচ্ছে! স্বয়ং পূর্ণিমার চাঁদ যার ঘরে, সে কি আর সামান্য নক্ষত্র দেখে খুসী হয়!

মাধুরী গম্ভীর হইয়া কহিল—সত্যি কবে যাবি বল্‌ ভাই!

কিন্তু "জিনিয়াসটীকে" যেমন অসাধারণ জীব বলে মনে করেছিস্, তা নয়,—স্বচক্ষে দেখলে একবারে নিরাশ হবি—

—তোর অত ভীত হবার কারণ নেই—খাঁটি জিনিষের মূল্য আমি নিজেই যাচাই করে নেব—

একটু থামিয়া কি ভাবিয়া সবিতা পুনরায় কহিল—আচ্ছা মাধুরী, অতুল বাবুর সঙ্গে তোর কি করে' প্রথম দেখা হল, কেমন করে হঠাৎ তুই প্রেমে পড়লি—এসব জানতে আমার বড় কৌতুহল হয়। উপন্যাসে "প্রথম দর্শনেই প্রেমের" কথা লেখা থাকে বটে, তোদের কি তাই হয়েছিল?

মাধুরী মৃদু হাসিয়া বলিল—উপন্যাসে যা লেখা থাকে না, এমন জিনিষও মানুষের জীবনে ঘটে! কিন্তু তুই যে আমার কথাই জিজ্ঞাসা করছিস্—তোর কথা কি আমারও কিছু জানবার নেই—?

—আমি তো আর তোর মত প্রেমে পড়িনি, কোন কবির প্রেয়সীও হইনি যে, আমার জীবনের রহস্য জানবার জন্য ব্যস্ত হতে হবে!

মাধুরী অনুযোগের সুরে বলিল—তুই কি তবে চিরকালই আইবুড়ো হয়ে থাকবি?

—কেন সেটা কি খুবই শোচনীয় অবস্থা নাকি? আমার কথা ভেবে তোর চিত্ত যদি এতই করুণ হয়ে থাকে,—তবে তোকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমি দিব্য সুস্থচিত্তে আরামে আছি,—কোন পুরুষের দাসত্ব করবার বা তার গৃহদুর্গে বন্দিনী হবার দুর্নিবার লোভ আমার মনে এখনও হয় নি—!

সবিতার কথার মধ্যে একটা শ্লেষের সুর ছিল। মাধুরী

হাসিতে হাসিতে বলিল—ভুল ব্যাখ্যা করিসনে ভাই! গৃহদুর্গে নয়, হৃদয় দুর্গে বন্দিনী, আর দাসীত্ব নয়, রাণীগিরি—! বৈদিক মন্ত্র শুনিসনি—ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব—

—ওগুলো তো পুরুষদের রচনা! শিকার ধরবার জন্য মন-ভুলানো বড় বড় কথা!—

বলিতে বলিতে সবিতা গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল,—আমার যে জীবনের কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেছে, ভাই।—আমি যদি না থাকি, তবে বাবাকে দেখ্‌বে কে, তাঁর হয়ত অনেকদিন খাওয়াই হবে না। মার যাবার পর থেকে—

—সত্যি, মাসীমার অভাবে সমস্ত বাড়ীখানাই যেন খালি বোধ হচ্ছে। কি ভালই বাসতেন আমাকে—ঠিক নিজের পেটের মেয়ের মতই—!

দুই বন্ধুরই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাধুরী বলিল—মিঃ রুদ্রের উপর ওঁর তো অসীম শ্রদ্ধা,—বলেন, এতবড় দেশনায়ক এযুগে আর নেই—দধীচীর মত নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে দেশের সেবা করছেন—

সবিতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল,—মার শোকে—বাবা বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তবু দেশের কাজে এক দিনের জন্যও উপেক্ষা করেন নি, সকল আঘাত হিমালয়ের মতই মাথা পেতে সহ্য করেছেন! আমি সেই পিতার মেয়ে হয়ে তাঁকে সেবা করবার অধিকার পেয়ে ধন্য—!

মাধুরী মাথা নাড়িয়া সবিতার এই উক্তি সমর্থন করিল।

সবিতা কহিতে লাগিল—এর তুলনায় বিবাহিত জীবন তুচ্ছ—সঙ্কীর্ণ, এমন কি, আমার কাছে সেটা ঘোর স্বার্থপরতা ব'লেই মনে হয়।

হঠাৎ মাধুরীর দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত হাস্যের সঙ্গে পুনরায় বলিল—তাই ব'লে সকলের বিবাহিত জীবনই যে মন্দ, এমন কথা বলছি নে! কারু কারু জীবনে উচ্চ আদর্শও থাকতে পারে—যেমন তোর—!

মাধুরী মৃদু হাসিয়া বলিল থাক থাক, আমাকে আর খোসামদ করতে হবে না—! কিন্তু আদর্শ রথের চূড়ার মত—বাস্তব জীবনের পথে চলতে গিয়ে সে সময় সময় হেলে পড়ে, পথের ধুলায় মলিন হয়ে উঠে—

সবিতা উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পাশের ঘর হইতে আহ্বান আসিল—সবিতা—সবিতা—

—যাই, বাবা—

মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এখন চললুম, ভাই—

সবিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এরই মধ্যে যাবি কিরে? বাবার সঙ্গে দেখা করবি চল—

বলিয়া মাধুরীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সবিতা পাশের ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া কহিল—

—বাবা, একবার এই ঘরে এস না, দেখ কে এসেছে—

গণপতি আদালতের পোষাকু পরিয়াই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন—কি বল্‌ছিস, সবিতা?

পরক্ষণেই একটী অপরিচিতা তরুণীর দিকে চোখ পড়িতেই ঈষৎ বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিলেন।

সবিতা হাসিয়া বলিল—চিনতে পারনি! ও মাধুরী—আমার কলেজের সহপাঠী, কতবার ওকে দেখেছ—

মাধুরী শশব্যস্তে গণপতির পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। সস্নেহ হাস্যে গণপতি কহিলেন—বেশ—বেশ, ভাল আছ তো মা—

সবিতা সকৌতুকে বলিল—তুমি ওকে যে-সে লোক মনে করো না, বাবা! প্রসিদ্ধ কবি অতুল রায়ের উনি সহধর্ম্মিনী—

মাধুরী সবিতার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

গণপতি কহিলেন—বটে, অতুল বাবু যে আমার একজন বন্ধু! এখনকার যুবকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী কবি, তাঁর সেই 'বাঁচা-মরার গানটা' আমার তো প্রায় কণ্ঠস্থই আছে।

মাধুরীর অন্তরে দেশনায়ক গণপতির উপরে শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে ঘাড় হেট করিয়া মাটির দিকে সে চাহিয়া রহিল।

পিতার দিকে চাহিয়া সবিতা প্রশ্ন করিল—তোমার আজ এত দেরী হল কেন, বাবা?

—আজ মস্ত বড় একটা সভা ছিল যে, আমাকেই করেছিল সভাপতি, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত থাকতে হল—

সবিতা অনুযোগের স্বরে বলিল—সব সভাসমিতিতে তোমাকেই সভাপতি হতে হবে! কেন, আর কি কোন লোক নেই? তোমার শরীরটা যে ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে, সে তুমি মোটেই বুঝতে পারছ না, বাবা—

গণপতি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধুরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—অতুলবাবুকে একদিন আসতে বল্‌বে, তাঁর নূতন কবিতা শোনা যাবে। তুমিও সঙ্গে আসবে, মা—

সবিতা সানন্দে কহিল,—ওরা দুজনে এলে বেশ হবে! সেদিন চলনা বাবা, সকলে মিলে বেড়িয়ে আসি—শিবপুরের বাগান, কি বজবজ পর্য্যন্ত। গঙ্গার উপরেই কবির কাব্য শোনা যাবে—

মাধুরীর দিকে চাহিয়া সবিতা শেষের কথাগুলি বলিল।

গণপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—অর্থাৎ তোর মতলব, সে-দিন আমি আর কোন কাজ যেন না করতে পারি! কিন্তু—

—ওর মধ্যে আর কিন্তু নেই, বাবা,—কথাটা পাকা হয়েই রইল—

—অসীমকেও আসতে বলে দেব, কি বলিস্—

—সে তোমার যাকে খুসী বলো!

বলিয়া মাধুরীর হাত ধরিয়া সবিতা কহিল—চল্ মাধুরী, একটু মিষ্টিমুখ করবি,—বন্ধুর বাড়ীতে এসে শুধু মুখে যেতে নেই—

তারপর পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তুমিও ততক্ষণ পোষাক টোষাকগুলো খুলে ফেল, বাবা—

মাধুরী সবিতার কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল—অসীমবাবু লোকটী কে, ভাই?

সবিতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাধুরীর হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

মাধুরীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে সবিতা ফটক পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, গণপতি তাঁহার মোটা লাঠী খানা হাতে করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সবিতা সবিস্ময়ে পিতার দিকে চাহিয়া কহিল—একি বাবা, আবার কোথাও যাবে নাকি।

—বিনোদবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করবার কথা ছিল—

সবিতা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—রাত্রি ৯টা বাজে! না, না, এই রাত্রে হিমের মধ্যে কোথাও তুমি যেতে পারবে না—!

বলিয়া পিতার হাত হইতে লাঠী খানা লইয়া গৃহের এক কোণে রাখিয়া দিল।

গণপতি আর কোন কথা না বলিয়া, নিরুপায় ভাবে এক-খানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সবিতা তাঁহার পরিত্যক্ত পোষাকগুলি যথাস্থানে গোছাইয়া রাখিতে লাগিল। বাড়ীতে দাসদাসীর অভাব না থাকিলেও, সবিতা পিতার সমস্ত কাজ নিজের হাতে করিতেই ভালবাসিত। অন্য কেহ তাহা করিতে আসিলেও, গণপতি খুঁটীনাটি ধরিয়া এমন সোরগোল বাধাইয়া তুলিতেন যে, কোন ভৃত্য তাঁহার কোন কাজ করিতে স [illegible]

গণপতি লম্বা কে [illegible] য়া এক[illegible]খানা শাল গায়ে জড়াইয়া

বলিলেন,—হাঁারে, অসীমকে তো কয়দিন থেকে দেখ্‌ছি নে। সে কি এর মধ্যে এসেছিল?

সবিতা ঝাড়ন দিয়া পিতার সম্মুখের টেবিলটা পরিষ্কার করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল—কই বাবা, অসীম-দা তো আসে নি—

তারপর একটু থামিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—বোধ হয় কোথাও দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হবার খবর এসেছে বা গঙ্গাস্নানের যোগ-টোগ আছে—

সবিতার কণ্ঠস্বরে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু অভিমানের রেশ ফুটিয়া উঠিল।

গণপতি কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন—তোকে বুঝি কিছু বলে যায় নি! ভেবেছে, ফিরে এসে তার অভিযানের কথা ব'লে একেবারে তাক লাগিয়ে দেবে—!

সবিতা ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—তার অভিযানের কাহিনী শোনবার জন্য আমি কিছুমাত্র ব্যগ্র নই,—আমার অত সময়ও নেই—

গণপতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা তুই যদি নাই শুনিস, লিখে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবে—!

সবিতাও এবার হাসিয়া ফেলিল।

গণপতির মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। মাতৃহীনা একম[illegible] কন্যা[illegible] পুত্রের মতই তিনি সযত্নে শিক্ষিত করিয়াছেন। [illegible] তাহাকে সৎপাত্রে দিতে না পারিতেছেন, ত[illegible] কর্ত্তব্যের শেষ হইবে

না। এক একবার ভাবিতেন, কন্যা স্বামীগৃহে চলিয়া গেলে, তাঁহার ঘর অন্ধকার, জীবন শূন্য হইয়া পড়িবে,—তিনি কি লইয়া থাকিবেন? আরও কিছুদিন যদি সবিতা তাঁহার গৃহে থাকে, ক্ষতি কি? তিনি গোঁড়া সমাজের চোখরাঙানীতে ভয় করেন না।

কিন্তু সে কল্পনায় তাঁহার মন বিশেষ শান্ত হইত না।······ এই অসীম ছেলেটী মন্দ নয়, উচ্চশিক্ষিত, তাঁহার বাল্যবন্ধু বিশ্বপতির ভ্রাতষ্পুত্র। বাল্যকাল হইতেই সে ঘরের ছেলের মত তাঁহার বাড়ীতে আসিতেছে, সবিতার সঙ্গে একত্র পড়াশুনা, খেলাধুলা করিয়াছে। তাহার হাতে সবিতাকে দিলে কেমন হয়? বিশ্বপতি নিশ্চয়ই আপত্তি করিবে না। অসীম সবিতাকে বোধ হয় ভালও বাসে, আর সবিতা ?···সেও বোধ হয়···

প্রকাশ্যে কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া গণপতি কহিলেন—ওর কাকা বিশ্বপতির মত অসীমেরও কতকগুলো খেয়াল আছে, কিন্তু তাহলেও ও ছেলে মন্দ নয়, ওকে আমার বড় ভাল লাগে। দেশের কাজ করবার দিকে ঝোঁক আছে, পাণ্ডিত্যের গর্ব্বও নাই। এমন সব ছেলেই তো চাই!

সবিতা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব উদাস করিয়া বলিল—বসে বসে অসীম-দার গুণবর্ণনা ক'রে আর কি হবে? এইবার খাবে চল—

কিন্তু গণপতি আসন ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মিত্র সাহেব দেখা করিতে আসিয়াছেন। গণপতি কহিলেন,—কে—বিনোদ বাবু? নিয়ে আয় এখানে—

তারপর সবিতার অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুই

আমাকে যেতে দিলি নে, তার ফলে বেচারা বিনোদ বাবুকেই আস্‌তে হল—

গণপতির কথা শেষ হইতে না হইতে একটী ৩২।৩৩ বৎসরের যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সপ্রতিভভাবে বলিল—নমস্কার মিঃ রুদ্র! সন্ধ্যাবেলা আপনার জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলাম, কিন্তু আপনার আর দেখা নাই! সুপ্রভা বললেন, হয়ত আপনার কোন অসুখ করেছে—

গণপতি ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—না—না, অসুখ কিছুই নয়। তবে আমার এই ছোট মা-টির বুড়ো ছেলের উপর খুব কড়া শাসন কিনা? একেবারে 'অটোক্রেশী—'ডেমোক্রেশী' ও মোটেই মান্‌তে চায় না। ওর ধারণা, রাত্রে হিম লাগালে আমার অসুখ করবে—

বলিয়া গণপতি প্রসন্নভাবে হাসিতে লাগিলেন। সবিতার মুখেও সলজ্জ মৃদু হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

বিনোদের পরণে একটা ঢিলা ইজের, গায়ে লম্বা আলখেল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী। শুনা যায়, সে এই বেশটা নিজে আবিষ্কার করিয়াছে—তাহার মতে এইটীই খাঁটি বিশ্বপ্রেমিকের পোষাক! বিনোদের চোখ দুইটী ক্ষুদ্র, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সবিতার মনে হইল, তাহার প্রকৃতির মধ্যে কি যেন একটা হিংস্র বর্ব্বর ভাব লুকাইয়া আছে। মোটের উপর, বিনোদকে দেখিয়া তাহার মনে তেমন শ্রদ্ধার ভাব জাগিল না, বরং একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। বিনোদের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে সে ক্ষুদ্র একটী নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—অসুখ হওয়াটা আমি একটা 'ক্রাইম' বলে মনে করি, মিঃ রুদ্র! সব সময়ে 'পাবলিকের' কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, অসুখ হবার সময়ও আমার নেই! আমি যখন আমেরিকায় ছিলুম, তখন একবেলা মাথা ধরে কলেজে যেতে পারিনি বলে সে যে, কী লজ্জা, তা বলে বোঝাতে পারবো না! পরদিন মহিলা বন্ধুরা তো আমাকে দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। আসল কথা, সভ্য আমেরিকা 'রিয়েলিটি' নিয়েই ব্যস্ত, 'সেন্টিমেণ্টের' ধার তারা ধারে না, তাই অসুখ জিনিষটা ওরা দুচক্ষে দেখতে পারে না। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নাম শুনেছেন তো! তিনি আমার একজন বন্ধু ছিলেন। দেশে ফিরে আসবার সময়, তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বললুম, ভারতবাসীদের জন্য আপনি কি 'মেসেজ' দিতে চান? তিনি কোন কথা না বলে হোয়াইট হাউসের বিশাল হলের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলেন। তার পর হঠাৎ এক সময় থেমে আমার দিকে ফিরে, আমার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন,—Don't be ill,—this is my message to India, boy!—

শেষ কথা গুলি বলিবার সময় দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী নাটকীয় ভঙ্গীতে উর্দ্ধে তুলিয়া বিনোদ সহসা নীরব হইল।

গণপতি নিরুপায়ভাবে বিনোদের সেই জলস্রোতের মত অবিরাম বাক্যরাশি শুনিতেছিলেন। এইবার—একটু ফাঁক পাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—বিনোদবাবু, আপনার যেমন

প্রতিভা, তাতে আমেরিকায় থাকলেও আপনি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা হতে পারতেন—

বিনোদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—প্রেসিডেণ্ট উইলসনও আমাকে তাই বলেছিলেন, এমন কি আমাকে সিনেটের মেম্বর পর্য্যন্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি করি, জন্মভূমির আহ্বান, আমাকে ফিরতে হল দেশে—

একটু থামিয়া, হঠাৎ দুই হাতের মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল,—কিন্তু এখানে এসে দেখি, সব Rotten—rotten! ধর্ম্ম-সমাজ-সাহিত্য-রাষ্ট্র সব পচে গেছে! এর আমূল সংস্কার করতে হবে, আগাগোড়া সব ভাঙ্গতে হবে। আর সেজন্য চাই বোলসেভিজম্—কম্যুনিজম্! রাশিয়ায় গেলে লেনিন আমাকে বলেছিলেন,—লেনিন লোকটা কেমন ছিলেন জানেন, একটা আস্ত আগ্নেয়গিরি—বিসুবিয়স—কার্ল মাকসের মানসপুত্র—মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ—

পাছে বিনোদ লেনিনের সম্বন্ধে একটা বড় বক্তৃতা জুড়িয়া দেয়, এই ভয়ে গণপতি তাড়াতাড়ি বলিলেন—আপনি সেই ব্যাপারটার কিছু সন্ধান করলেন, মিঃ মিত্র,—আমার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াবে না তো?

বিনোদ মুখের ভাব যতদূর সম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল,—সেই কথাই তো আপনাকে বলবো বলে এসেছি। ব্যাপারটা খুবই জটীল হয়ে উঠেছে, মিঃ রুদ্র! বিশ্বপতি বাবু একদল ছোট লোক জুটিয়ে ভোট সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন,—বলছেন, আপনাকে সরিয়ে উনিই সঙ্ঘের সভাপতি হবেন!

গণপতি উদার ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—বেশ তো, বিশ্বপতিই সভাপতি হবেন! আমি তা হলে বেঁচে যাই, এ বয়সে এত পরিশ্রম শরীরে আর সহ্যও হয় না—

বিনোদ কয়েক মূহূর্ত্ত অবাক হইয়া গণপতির দিকে চাহিয়া রহিল,—যেন কথাটা সে বিশ্বাস করিতেই পারিল না। অবশেষে উত্তেজিত স্বরে কহিল,—বিশ্বপতি বাবু হবেন সঙ্ঘের সভাপতি! তাহ'লেই হয়েছে! উনি লোক ভাল হতে পারেন, কিন্তু ওঁর না আছে রাজনীতির জ্ঞান, না আছে প্রভাব প্রতিপত্তি!

গণপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—লোকে যদি তাকেই নেতার আসনে বসাতে চায়, আমার তো কিছু আপত্তি হতে পারে না! আমি চাই, দেশের সেবা করতে, নেতৃত্ব আমার কাম্য নয়—

বলিয়া গণপতি প্রশান্ত ভাবে হাসিতে লাগিলেন।

বিনোদের অধরকোণে বিদ্রূপ-হাস্যের রেখা মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিল, পরক্ষণেই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া সে কহিল—আপনি মহৎ, মিঃ রুদ্র, সুতরাং সকলকেই আপনি নিজের মত মহৎ ভাবেন। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্যই আপনাকে একটু কঠোর হতে হবে! এই বিশ্বপতি বাবুর মত নেংটী-পরা লোককে দেশের লোক চায় না, ভুল আপনার! তারা আপনাকেই চায়। এসপ্তাহের 'ক্ষণপ্রভা' কাগজে একথাটা স্পষ্ট করেই আমি লিখেছি—

গণপতি ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ক্ষণপ্রভায়' কি লিখেছেন?

—লিখেছি যে, দেশের একমাত্র নেতা আপনি, আপনি ছাড়া আর কেউ নেতার আসনে বস্‌তে পারে না; যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে সে দেশদ্রোহী, ভণ্ড, তাকে—

গণপতি সঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন,—কিন্তু বিশ্বপতি আমার পরম বন্ধু—

বিনোদ ক্রূর হাসিয়া বলিল,—দেশের কাজে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কোন মূল্য নেই! আপনি হয়ত জানেন না, বিশ্বপতি বাবুর প্রধান অস্ত্র, আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার! এই উপায়েই তিনি অশিক্ষিত লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন!

গণপতির ললাটে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎবিকাশের মত বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল, পরক্ষণেই তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন, —আমার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার! কিসের কুৎসা?

বিনোদ তাহার ক্ষুদ্র দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি গণপতির মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—সে বলে, সঙ্ঘের তহবিলের দশ হাজার টাকা আপনার হাতে আছে, আপনি এখনও তার হিসাব দেন নি—

গণপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল, রুক্ষ স্বরে তিনি কহিলেন,—বিশ্বপতি এই কথা প্রচার করেছে,—এও কি সম্ভব! আর লোকেও এমন কথা বিশ্বাস করবে, আপনি বলতে চান, বিনোদ বাবু—?

—Mass Mind আপনি জানেন না, মিঃ রুদ্র! আমেরিকায় থেকে আমি ওর খুবই পরিচয় পেয়েছি। তারা সব বিশ্বাস

করতে পারে, আজ যাকে তারা দেবতা বলে পূজা করে, কাল তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারে—!

গণপতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধীরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বিনোদ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, —তবু তো আমাদের দেশে মেয়েরা এখনো কাজে যোগ দেয় নি! তাহ'লে ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন হ'ত! আমেরিকায় মেয়েরাই সব কাজে অগ্রণী। কংগ্রেস, সিনেট, এমন কি, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট পর্য্যন্ত তাদের খুসী করবার জন্য ব্যস্ত। সুপ্রভা বলেন, আমাদের দেশেও সেদিন শীঘ্রই আসবে—

সুপ্রভা কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য গণপতির মোটেই আগ্রহ ছিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তারপর সহসা এক সময়ে থামিয়া বিনোদের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—নিজের জন্য নয়, দেশের কল্যাণের জন্যই বিশ্বপতির বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হবে! আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ—মিত্র—

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এই মহৎ সঙ্কল্পের জন্য, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি! আপনার জন্য আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবো। কালই 'ক্ষণপ্রভাতে' একটা জ্বালাময় প্রবন্ধ বেরুবে, তারপর একটা বিরাট সভা ডেকে বিশ্বপতি বাবুর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করবো। ব্যস, বিশ্বপতি বাবুকে আর মাথা তুলতে হবে না—

বিনোদ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সবিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্বেগ-পূর্ণ স্বরে বলিল—বাবা, বিনোদ বাবু, কি সব বল্‌ছিলেন, তুমি কি তাঁর সব কথা বিশ্বাস কর? বিশ্বপতি কাকাকে তুমি তো জান—

গণপতি সে কথার উত্তর না দিয়া সবিতার মুখের দিকে লক্ষ্যহীন ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সবিতা পুনরায় কহিল—তুমি যাই বল, বাবা,—এই বিনোদ বাবু লোকটী ভাল নয়,—ওঁর কথা তুমি বিশ্বাস করো না!

গণপতি একথারও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মনের ভিতর তখন বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল।

সবিতা প্রভাতে যখন শয্যা হইতে উঠিয়া আসিল, তখনও বাড়ীর সকলে জাগে নাই। সে বাহিরের আঙ্গিনায় নামিয়া অন্যমনস্কভাবে বেড়াইতে লাগিল। তাহার বন্ধনমুক্ত, ঈষৎ বিশৃঙ্খল, লম্বিত বেণী পিঠের উপর দুলিতেছিল, প্রভাত বায়ুতে অলকগুচ্ছ ললাটে, কপোলে, সুন্দর গ্রীবাদেশে চপল শিশুর মত ক্রীড়া করিতেছিল। পরিধানে নীলাভ রঙের সাড়ী, তাহাতে সুগৌর তনুর কান্তি যেন আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। সবিতার মুখে চিন্তার ছায়া, দৃষ্টি বিষাদ ম্লান,—পূর্ব্ব রাত্রিতে গণপতি ও বিনোদের কথাবার্ত্তার যেটুকু সে শুনিয়াছিল, তাহাই বোধ করি ভাবিতেছিল।

বাহিরের ফটক পার হইয়া একটী দীর্ঘাকৃতি প্রিয়দর্শন যুবক কখন যে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সবিতা তাহা লক্ষ্য করে নাই। সহসা মৃদুনিঃশ্বাস-পতনের শব্দে চমকিত হইয়া সে ফিরিয়া চাহিল। তাহার বিষাদম্লান মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সাগ্রহে সে কহিল—

—কখন এলে অসীম-দা—?

—এই তো সবে আস্‌ছি। এ কয়দিন কলকাতায় ছিলাম না, বোধ হয় জান—?

সবিতা বিস্ময়ের স্বরে কহিল—কি ক'রে জানবো বল! তুমি কখন কোথায় থাক, তার হিসাব রাখাতো আর আমার কাজ নয়—

অসীম কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমিও সে খবর জানতাম না—

সবিতা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিল।

—আমার এক সহপাঠী বন্ধুর বাড়ী কলকাতারই কাছে কোন পল্লীগ্রামে। বন্ধু এসে বল্‌লে, তার মহা বিপদ, তখনই তার সঙ্গে তার গ্রামে যেতে হবে। বন্ধুর মুখের ভাব দেখে কোন প্রশ্ন করতেই সাহস হ'ল না,—যে বেশে ছিলাম, সেই বেশেই বেরিয়ে পড়লাম—

সবিতা উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—গিয়ে কি দেখলে—?

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া অসীম ধীরে ধীরে বলিল,—দেখলাম তার বুড়ো মা তিন দিন হল মারা গেছেন, তাঁর মৃতদেহ তখনও সৎকার হয় নি—

আঁা, বল কি অসীম-দা! সে গাঁয়ে কি মানুষ নেই—?

—আছে, তার স্বজাতিরও অভাব নাই, কিন্তু বন্ধুকে তারা অনেক দিন আগেই জাতিচ্যুত এক-ঘরে করেছে। যারা জাতিচ্যুত, অস্পৃশ্য, তাদের মৃতদেহ সমাজের নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক লোকেরা স্পর্শ করবে কি করে?

সবিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিছুক্ষণ তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তোমার বন্ধুর কি এমন গুরুতর অপরাধ যে, সমাজ তাঁর উপর এই বজ্রদণ্ড নিক্ষেপ করেছে—?

—সে কথা শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না, সবিতা, কিন্তু তবুও তা সত্য। আমার বন্ধু জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও বড় গরিব।

তার বিধবা মা টাকার অভাবে একমাত্র মেয়ের কিছুতেই বিয়ে দিতে পারেন নাই। কিন্তু টাকা নেই বলেই-তো মেয়ের বয়স অপেক্ষা করে না। ক্রমে মেয়ের বয়স ১৭।১৮ বৎসর পার হতে চল্‌ল, সমাজপতিরা হুকুম দিলেন, মেয়ের বিয়ে না দিলে তাঁরা সমাজ থেকে ওদের বহিস্কৃত করবেন। ইহকালে সমাজের ভয়, পরকালে নরকের ভয়, মেয়ের মা পাগল হয়ে উঠলেন। অবশেষে মেয়ের এক মামা মেয়েকে নিয়ে গেলেন কাশী। কিছুদিন পরে মেয়েকে নিয়ে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন দেখা গেল, সে সন্থ বিধবা। সমাজপতিরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, যাক, তবুতো মন্ত্র পড়ে বিয়ে একটা হয়েছিল,—ধর্ম্ম সমাজ সব রক্ষা হল!

সবিতা সবিস্ময়ে কহিল,—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, অসীম-দা যে, মেয়েটা আজীবন বিধবা হয়ে থাক ক্ষতি নেই, কুমারী হয়ে থাকলেই ধর্ম্ম সমাজ সব রসাতলে যেত—

—এই রকমই নাকি শাস্ত্রের বিধান—!

সবিতা উত্তেজিত স্বরে কহিল,—কখনো নয়, হতেই পারে না!—আর এই যদি শাস্ত্রের বিধান হয়, তবে সে শাস্ত্র চুলোয় যাক, তা কেউ মানতে পারে না—!

অসীম কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—কিন্তু এইটুকু শুনেই তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, সবখানি শুনলে না জানি কি করবে! সমাজপতিরা বেশীদিন শান্তিতে থাকতে পারলেন না। কাশীর থেকে কে একজন এসে প্রকাশ করে দিল, মেয়ের বিয়ে মোটেই হয় নি, মেয়ের মামা মেয়েকে বিধবা

সাজিয়ে সমাজকে প্রতারিত করেছে! দাবানলের ন্যায় এই ভয়ানক সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখনি চণ্ডীমণ্ডপে সমাজপতিদের বড় বৈঠক বসে গেল, বাচস্পতি শিরোমণিরা ঘন ঘন টিকী নেড়ে, নস্য টেনে, অনেক বিচার আলোচনা তর্জ্জন গর্জ্জন করলেন। আর তার ফলে বন্ধুরা সব হলেন জাতিচ্যুত, পতিত, অস্পৃশ্য—!

অসীম ও সবিতা দুইজনেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল,—তাহাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষোভ ও বেদনা বোধ হয় তাহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না! কিছুক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সবিতা কহিল,—অসীম-দা তুমি গিয়ে সেই বৃদ্ধাব মৃতদেহ সৎকার করেছ তো?

—হ্যাঁ, বন্ধু আর আমি দুজনে মিলে শেষ কর্ত্তব্য করলাম। গ্রামের একজন লোকও এসে উঁকি দিয়ে দেখল না, সাহায্য করা তো দূরের কথা!

সবিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—অসীম-দা এরা কি মানুষ—হৃদয় বলে এদের কি কোন পদার্থ নেই—?

—এইতো বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ, সবিতা! আর এরাই সব বাঙ্গলাদেশের লোক—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা এমনই অসহায় ভাবে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সকল অত্যাচার সহ্য করেছে—শেয়াল কুকুরের মত মরেছে! মানুষের মত মরতে কেউ তাদের শেখায়নি, মানুষের মত বাঁচতেও তারা জানে না! শাস্ত্র ধর্ম্ম সমাজ সকলে মিলে তাদের শুধু একই উপদেশ দিয়েছে—অদৃষ্ট—অদৃষ্ট! সেই ভীষণ অদৃষ্টের চাপে তারা পিষে মরেছে—মরছে!

সবিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল—ওঃ, কী দীন, অসহায় এ দেশের মেয়েরা! বিয়ে না করে তাদের নিষ্কৃতি নেই,—অন্ততঃপক্ষে জাল করে বিধবা সেজেও তাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে! যে সমাজ, এমন সব পাপাচারের প্রশ্রয় দিতে পারে, তাদের কখনো কল্যাণ হয় না!

—সেই জন্যই-তো এদেশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অনেকদিন আগেই বিদায় নিয়েছেন—

বলিয়া অসীম নীরব হইল।

একটু পরে কহিল—এইবার চলি, সবিতা। কাকীমাকে ব'লে যাওয়া হয় নি,—সুতরাং আমার অদৃষ্টেও বহু পুরস্কার সঞ্চিত হয়ে আছে—!

সবিতা ব্যগ্রভাবে কহিল—সে কি হয় অসীম-দা! কতদূর থেকে হেঁটে আস্‌ছ, এ কয়দিন আহার নিদ্রার দশা যা হয়েছে, তাতো বুঝতেই পারছি! তোমাকে একটু বসে যেতেই হবে। কাকীমার কাছে যে পাওনা আছে, আধঘণ্টা আগে গেলে তাতো আর কমবে না।

অসীমকে আর কোন আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া সবিতা অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল, অসীম তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

সবিতার পড়িবার ঘরে আসিয়া একখানা আরাম কেদারা দখল করিয়া অসীম কহিল—আমাকে ডেকে এনে কাজটি ভাল করনি, সবিতা! উঠ্‌তে আর ইচ্ছা হচ্ছে না,—আঃ—

সবিতা হাসিয়া বলিল—ওঠবার জন্য তোমাকে কেউতো আর মাথার দিব্যি দিচ্ছে না! সুতরাং কোন গুরুতর ভাবনার কারণ

নেই।...আমি কিন্তু তোমার সেই বন্ধুর বোনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি নে! তার কি দশা হবে বলতে পার, অসীম-দা?

অসীম ম্লান হাসিয়া বলিল—কি আর হবে! বাঙ্গলাদেশের আরও অনেক হতভাগিনীর মত জীবন্মৃত হয়ে থাকবে, অথবা নিতান্ত নিরুপায় হলে—

অসীম অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। সবিতা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি করবে—আত্মহত্যা?

অসীম উদাসভাবে কহিল—মৃত্যুটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নয়, তার চেয়েও ভীষণ অবস্থা আছে। কিন্তু থাক, ও কথার আলোচনায় আর কাজ নেই!......

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অসীম পুনরায় কহিল—এই সব অদৃষ্টবাদী হতভাগাদের দেখে আমার কি মনে হয়, জান, সবিতা! বিদ্যুতের শিখায় ওদের এই তামসিক জড়তা পুড়িয়ে ফেলি, অটল সহিষ্ণুতা বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে দিই, অশান্তির আগুণে ওদের স্থবির মন জ্বালিয়ে তুলি,—যাতে শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জ্জনা একদিনে ভস্মসাৎ হয়ে যায়। এর চেয়ে বড় কাজ আমি তো আর দেখি নে—!

—কিন্তু তুমি একা কি করবে অসীম-দা?

—যেটুকু পারি, অন্ততঃ একটা জীবনতো দিতে পারবো!

সবিতা কোন কথা বলিল না। শরতের নির্ম্মল আকাশে লঘু মেঘখণ্ডের মত তাহার ললাটে মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তার ছায়া দেখা দিল। পরক্ষণেই ম্লান হাসিয়া সে কহিল—আমিও যদি তোমার ব্রত গ্রহণ করি, তোমার কোন আপত্তি আছে অসীম-দা?

অসীম মৃদুস্বরে কহিল,—আমি আপত্তি না করলেও, তা করবার লোকের অভাব হবে না! প্রথমেই জ্যাঠামশায় আপত্তি তুলবেন, তাঁর চেয়েও আত্মীয় যিনি পরে আসবেন, তিনি তো একেবারে মারমুখো হয়ে উঠবেন!

অসীমের কথার ইঙ্গিতে সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কহিল—তোমার মুখে এসব সেকেলে রসিকতা শোভা পায় না, অসীম-দা! যে সব আত্মীয় আছেন, তাঁরাই থাকুন, আর কোন নূতন আত্মীয়ের আমার প্রয়োজন নেই। আমি তো বাবাকে বলেছি, তাঁর ঘরে চিরদিন কুমারী হয়ে থাকবো, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাবনা—

অসীম হাসিয়া কহিল,—এ সম্বন্ধে কোন গভীর আলোচনা করতে আপাততঃ আমি রাজী নই, কেননা ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ই কিঞ্চিৎ প্রবল হয়ে উঠেছে!

সবিতা অপ্রস্তুত ভাবে কহিল—ছি—ছি, কি অন্যায়, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছি! তুমি একটু বস, অসীম-দা, আমি এখনই আস্‌ছি।

সবিতা চলিয়া গেলে অসীম তাহারই শেষ কথাগুলি ভাবিতে লাগিল। সবিতা কুমারী হয়ে থাকিতে চায় কেন? রূপ, গুণ, বিদ্যা, পিতার অর্থ, পদমর্য্যাদা, কিছুরই তো তার অভাব নাই। কত বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে নিজে হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে আসিবে। কিসের দুঃখেই বা সে এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে যাইবে?·········

অসীম নিজের কল্পনায় নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। না—না,

তাহার মনের গোপন ঐশ্বর্য্য মনেই থাক, বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য সে তো নয়! কোনরূপ দুরাকাঙ্ক্ষাকেই সে প্রশ্রয় দিবে না,—সবিতার কাছে যে অকৃত্রিম স্নেহ সে পাইয়াছে, এই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তার বেশী কামনা করিবার অধিকার তাহার নাই।···

অসীম তাহার চিন্তাস্রোতে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছিল,—সহসা ভারী পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, গণপতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার গায়ে একটা ঢিলা ফতুয়া, পায়ে চটী, মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত, বোধ হয় অল্প কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়াছেন। অসীম তাড়াতাড়ি উঠিয়া গণপতিকে প্রণাম করিল।

গণপতি সহাস্যে কহিলেন—এই যে অসীম, কতক্ষণ এসেছ, সবিতাকে খবর দিয়েছ—?

অসীম সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আপনার শরীর আজকাল একটু ভাল আছে, জ্যাঠামশায়—!

গণপতি উদাসকণ্ঠে বলিলেন—শরীরের আর দোষ কি বল? এটা যন্ত্র বইতো নয়, সব সময়ে চাপ দিলে বিগড়ে যাবেই। তবু যতক্ষণ দেহে একবিন্দু শক্তি থাকবে, দেশের আহ্বান তো উপেক্ষা করতে পারবো না—

অসীম নেতা গণপতির নিষ্কাম আত্মোৎসর্গের কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইল,—ইনিই ত যথার্থ দেশসেবক কর্ম্মযোগী।

গণপতি একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—তোমার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে ভালই হল। কয়দিন থেকেই ভাবছি,

তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করবো। তুমি ছেলেমানুষ হলেও বুদ্ধিমান, পণ্ডিত—

অসীম গণপতির মুখে নিজের এই প্রশংসায় অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নত করিয়া রহিল।

গণপতি কহিতে লাগিলেন—সবিতার জন্য একটু ভাবনায় পড়েছি, বাবা! কলেজের লেখাপড়া তো ওর শেষ হল, এইবার ওর বিয়ে দিতে চাই—

অসীমের হৃদয় একটা অজ্ঞাত উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

—তুমি তো জান, ও আমার কত আদরের মেয়ে! ওকে এমন লোকের হাতে দিতে চাই, যে ওর মর্য্যাদা বুঝবে, ওকে সুখী করতে পারবে—

অসীম নিঃশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে লাগিল।

—তুমি ওকে ছেলেবেলা থেকেই জান। কি ও চায়, কিসে সুখী হবে, তোমার চেয়ে কেউ তা ভাল বুঝবে না—

বলিয়া গণপতি থামিলেন। অসীমের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দশগুণ বাড়িয়া গেল।……এইবার গণপতি না জানি কি বলিয়া বসেন! প্রতি মুহূর্ত্ত তাহার নিকট একটা যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

গণপতি অসীমের অবনত মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাই, আমার ইচ্ছা, তুমিই ওর জন্য একটী ভাল ছেলে দেখে দাও—

অসীমকে কে যেন শূন্যমার্গে তুলিয়া সহসা নীচে ফেলিয়া

দিল,—তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল! তবু নিজের মনের উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যথাসাধ্য সহজ স্বরেই সে বলিল—তাই দেখবো, জ্যাঠা মহাশয়—তবে সবিতার নিজের মতটাও জানা দরকার—

—সে ভারও তোমার উপর! তোমাকে ছাড়া আর কাউকে, বোধ হয়, ও মনের কথা বলবে না—!

গণপতি অসীমের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে গম্ভীরভাবে কহিলেন—আমার ওই একটা মেয়ে, ওকে দূর দেশে পাঠাতেও পারবো না! আমার ইচ্ছা, ও চোখের উপরেই থাকে—

অসীমের মনে আনন্দ কি নিরানন্দ, আশা কি নৈরাশ্য,—কোন ভাবের প্রবাহ চলিতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হৃদয়ের কোন গোপন কক্ষ হইতে কে যেন বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল—ওরে নির্বোধ, হতভাগ্য, নিজেকে এমনই ক'রে কি বঞ্চিত করবি? জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত ক্ষণিকের অবহেলায় ত্যাগ করবি? অন্যদিক হইতে আর একজন মাথা তুলিয়া তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলিল—এইতো চাই, কামনাকে যে এমনই ভাবে অর্জ্জুনের মত জয় করতে পারে, সেইতো বীর! তুমি যদি এত সহজে প্রলোভনে মুগ্ধ হও, তবে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করবার গর্ব্ব কেন?

···কে সত্য বলিতেছে? কাহার কথা সে শুনিবে? আর সবিতা—তাহার মনের কথা কি?···না, না, এ কঠিন ভার অসীম গ্রহণ করিতে পারিবে না!

গণপতি অন্যমনস্ক, সংশয়াকুলচিত্ত অসীমকে সচকিত করিয়া বলিলেন,—তবে এই কথাই রইল, তোমার উপর সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত! তুমি বোধ হয় শুনেছ, 'সঙ্ঘের' সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কোন দিকে এখন আমি মন দিতেই পার্‌ছি নে।

অসীম সবিস্ময়ে কহিল,—কি গোলযোগ হয়েছে, আমি তো কিছু শুনিনি, জ্যাঠা মশায়! কয়েক দিন কলকাতায় ছিলামও না।

—সত্যই তুমি কিছু শোন নি? বিশ্বপতি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

তারপর একটু থামিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন,— কেবল তাই নয়, তিনি নাকি আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে বেড়াচ্ছেন!

গণপতির কথায় অসীমের মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে কহিল,—কাকাবাবু আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু তিনি কারু নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করবেন, এ অসম্ভব;—তিনি তা কল্পনাও করতে পারেন না—!

গণপতি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্লেষের সুরে বলিলেন,—তোমার কাকাবাবু দেবতা হতে পারেন, কিন্তু দেবতার বাহন ভূতপ্রেতেরও তো অভাব নেই—

—কাকাবাবু জানতে পারলে কখনই এমন হীন কাজে প্রশ্রয় দেবেন না!

গণপতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—তাও সম্ভব! কিন্তু তাঁর মত সাধুপুরুষের সভাপতি হবার আকাঙ্ক্ষাই বা কেন? পদ ও ক্ষমতার লোভ মানুষকে যে বিপথে টেনে নিয়ে যায়, এ কি তিনি জানেন না?

বিশ্বপতির উপর পুনঃ পুনঃ শ্লেষবাক্য-প্রয়োগে অসীম ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু গণপতির মত গুরুজনের কথার প্রতিবাদ করিবার প্রগল্‌ভতাও তাহার ছিল না। সুতরাং নীরবেই সে বসিয়া রহিল।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গণপতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—দেশের জন্য প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ক্ষুণ্ণ করতে হয়। কিন্তু তবু বিশ্বপতিকে আমি আঘাত করতে চাইনে। তুমি জান, তার চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি।...

একটু থামিয়া কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,—শোন, অসীম, একমাত্র তুমিই এই আত্মঘাতী কলহের অবসান করতে পার!

অসীম বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে গণপতির দিকে চাহিল।

—তুমি তোমার কাকাবাবুকে জোর করে বল, আমার সঙ্গে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করতে। তোমার অনুরোধ সে কখনই উপেক্ষা করতে পারবে না—

অসীম কোন উত্তর না দিয়া নতনেত্রে বসিয়া রহিল।

গণপতি কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া বলিলেন,—বিশ্বপতির মত আমারও তুমি পরম স্নেহের পাত্র। আমার এই সামান্য কথাটা তুমি রাখবে না, অসীম—!

অসীম তবু পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়াই রহিল।

গণপতি ঈষৎ অধীর স্বরে বলিলেন,—আমার কথার উত্তর দাও, অসীম!

অসীম এবার গণপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—আপনারা উভয়েই আমার গুরুজন। এর মধ্যে আমাকে আর জড়াবেন না। তা ছাড়া, কাকাবাবু একবার যা সঙ্কল্প করেন, কারু অনুরোধেই তা থেকে বিচ্যুত হন না—

গণপতির মুখ লাল হইল, কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ-ভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন, অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—বুঝলাম, তোমার কাছেও ন্যায় ও সত্যের চেয়ে রক্তের সম্বন্ধই বড়! তবে তাই হোক, বিশ্বপতি যখন আমার সঙ্গে লড়াই করতে চায়, তখন আমাকেও প্রস্তুত হতে হবে—

বলিয়া গণপতি গুরু পদক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দ্বারের বাহিরে আসিয়া কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, প্রচ্ছন্ন-শ্লেষের সুরে কহিলেন,—সবিতার জন্য বসে আছ, বুঝি? কিন্তু তার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে কিনা সন্দেহ, বৃথা গল্প করবার সময় ওর নেই—!

বলিয়াই অসীমের দিকে আর ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া গণপতি একটু দ্রুতবেগেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

অসীম কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর নিজের পা দুটাকে কোন মতে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরের ফটকের দিকে চলিল। ফটক পার হইবার পূর্ব্বে সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া সবিতার পড়ার ঘরের দিকে

চাহিল, কিন্তু সবিতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। অসীম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িল।

পরমুহূর্ত্তেই একটা থালায় কিছু মিষ্টান্ন ও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সবিতা তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘর শূন্য, অসীম সেখানে নাই! দূরে ফটকের দিকে দৃষ্টি পড়িতে লক্ষ্য করিল, অসীম রাস্তা পার হইয়া যাইতেছে!

······একি, অসীম-দা এমন ভাবে হঠাৎ চলে গেল কেন? আমার জন্য একটু অপেক্ষা করতেও পারল না? আমাকে সে কি এতই উপেক্ষা—অবজ্ঞা করে?

ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সবিতার মন বিদ্যুৎগর্ভ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভারী হইয়া উঠিল। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া অসীমকে ডাকে, তাহাকে ফিরাইয়া আনে। পরক্ষণেই মনে হইল,—না, না, এ অপমানের পর, কিছুতেই সে তাহা করিতে পারিবে না! ফলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্পন্দভাবে অসীমের গমনপথের দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর চা ও মিষ্টান্নগুলি জানালা গলাইয়া সজোরে বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বিনোদের পত্নী সুপ্রভাকে অসাধারণ সুন্দরী বলা যায় না। কিন্তু তাহার দেহে এমন স্নিগ্ধকান্তি, মুখশ্রীতে এমন অপরূপ মাধুর্য্য ছিল, যাহাতে লোকের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইত। তাহার আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি রহস্যময়,—উষার উদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রহস্যময় দিগন্ত-রেখার মত সবখানি সে প্রকাশ করে না, অথচ মনকে প্রলুব্ধ করিয়া কোন সুদূর মায়ারাজ্যে লইয়া যায়। সুপ্রভার বয়স ২৫।২৬ বৎসরের কম নয়, কিন্তু প্রথম যৌবনের লাবণ্য এখনও যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে!

যাহারা নিজেকে দান করিয়াই সুখী হয়, প্রতিদানে কিছু চায় না, সুপ্রভা সেই শ্রেণীর মেয়ে ছিল না। সে যেমন সমগ্র দেহমন দিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে চাহিত, প্রতিদানে স্বামীর নিকট হইতেও সেইরূপ সর্ব্বস্বহারা ভালবাসা প্রত্যাশা করিত। কিন্তু সুপ্রভা অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল, তাহার সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। যে তীব্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ লইয়া সে স্বামীর নিকট আত্মনিবেদন করিতে যাইত, তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি বিনোদের ছিল না। শুষ্কপত্র যেমন স্রোতের উপরেই ভাসিয়া বেড়ায়, জলের নীচে ডুবিতে পারে না, বিনোদও তেমনি হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রবেশ করিতে পারিত না। সুতরাং তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে, সুপ্রভার মনের অসীম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সন্ধান কোনদিনই সে পাইল না। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার হইতে পূজারিণী যেমন তাহার সযত্নসজ্জিত অর্ঘ্যভার লইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া

আসে,—সুপ্রভাও তেমনি তাহার যৌবনের বরণডালা হাতে বিনোদের রুদ্ধ হৃদয়দ্বার হইতে বার বার ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিল।

পূজারিণীর এই ক্ষুব্ধ নৈরাশ্য উদাসীন দেবতা বুঝিতে পারিল না, সেজন্য কোন বেদনাও সে অনুভব করিল না। কিন্তু সুপ্রভার সমস্ত হৃদয় একটা গভীর অতৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই কি জীবন, এই কি সংসার ? এই আলোহীন, আশাহীন, নিরানন্দ অন্ধকূপের মধ্যে সে আপনাকে নিঃশেষে ছাড়িয়া দিবে কিরূপে ? এর চেয়ে বৃহত্তর জীবন কি আর কিছু নাই ? এই কারাগারের বাহিরে, উদার আকাশের তলে, উন্মুক্ত বায়ুতে দাঁড়াইবার সুযোগ সে কোন দিনই কি পাইবে না ?

সুপ্রভা আজও সন্ধ্যাবেলা একাকিনী বসিয়া এমনই সব চিন্তা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে, এই অপ্রিয় চিন্তা মন হইতে দূর করিবার জন্য সে একটা অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজ লইয়া বসিল। কিন্তু অস্থির মন তাহাতে শান্ত হইল না,—অতীতের বেদনাময় স্মৃতি থাকিয়া থাকিয়া কাঁটার মত তাহার মর্ম্মস্থলে বিঁধিতে লাগিল।

আপাদমস্তক সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া বিনোদ আসিয়া কহিল,—আমি একটা কাজে যাচ্ছি, বালিগঞ্জের দিকে—

সুপ্রভা সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিল মাত্র, পরক্ষণেই আবার কাজে মন নিবিষ্ট করিল ,—স্বামী কি কাজে যাইতেছেন, কখন ফিরিবেন,—সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই সে প্রকাশ করিল না।

সুপ্রভার এই ঔদাসীন্য বিনোদের নিকট অসহ্য বোধ হইল। এতবড় একটা গুরুতর কাজে সে যাইতেছে, সুপ্রভার কি তাহা জানিবার কিছুমাত্র কৌতুহল নাই? সে আপন মনেই কহিতে লাগিল,—বিলাসগড়ের রাজা এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি, ফিরতে হয়ত একটু রাত্রি হবে—

সুপ্রভা এবারও কোন কথা কহিল না।

বিনোদ কহিতে লাগিল,—বিলাসগড়ের রাজার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, রাজাদের মধ্যে ওঁর মত ধনীলোক খুব কমই আছে!······ যদি একবার হাত করতে পারি! নবযুগের 'রাজর্ষির' গুণকীর্ত্তন করে এরই মধ্যে খবরের কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে। এমনই আরও কিছু স্তবস্তুতি করলেই 'রাজর্ষি' প্রসন্ন হয়ে আমাকে বরদান করবেন—

বলিয়া নিজের অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশলের প্রশংসায় খুসী হইয়া বিনোদ হাসিতে লাগিল।

সুপ্রভা এবার মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে কহিল,—সত্যই কি এরা নামযশ প্রশংসার জন্য এমন লালায়িত?

বিনোদ সুপ্রভার কৌতুহল দেখিয়া মনে মনে খুসী হইল। রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে বলিল,—এমনই লালায়িত যে, তার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতেও প্রস্তুত! খবরের কাগজের নিন্দা এরা বিষাক্ত সাপের মতই ভয় করে—!

সুপ্রভা গম্ভীরভাবে বলিল,—করবারই কথা—যদি নিজেদের কুকীর্ত্তি সব প্রকাশ হয়ে পড়ে!······শুনেছি, এই বিলাসগড়ের রাজা ঘোর অত্যাচারী—তার প্রজাদের ধনপ্রাণ একমুহূর্ত্তও

নিরাপদ নয়,—স্ত্রী কন্যা নিয়ে মনের শান্তিতে তারা বাস করতে পারে না—!

বিনোদ মাথা নাড়িয়া বলিল,—যা শুনেছ, তার চেয়েও বেশী—

সুপ্রভা কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—অথচ এরই প্রশংসা খবরের কাগজে ছাপানোর জন্য তুমি ব্যগ্র—!

বিনোদ শ্লেষের সুরে কহিল—হুঁ, ব্যগ্রই বটে !—তবে রাজার উপর অহেতুক প্রীতির জন্য নয়, তার চেয়ে গুরুতর কারণে—

সুপ্রভার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, ব্যথিত স্বরে সে কহিল,—মিথ্যা প্রশংসার মূল্যস্বরূপ রাজা হয়ত কিছু টাকা দেবে ! সেই কি তোমার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ ?

বিনোদ শুষ্ক হাসিয়া বলিল,—তা ছাড়া এত বড় একজন রাজার অনুগ্রহ লাভ—!

সুপ্রভা অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিল, অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তোমার মুখে সব সময়ে দরিদ্রনারায়ণের বক্তৃতা শুনে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি সত্যই তাদের বন্ধু !—কিন্তু—

—এখন দেখ্‌ছ সেটা মস্ত ভুল ধারণা—!

বলিয়া বিনোদ জোরে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু ভুল ধারণা মোটেই নয়, প্রিয়তমে,—আমি তাদেরই বন্ধু, তাদের জন্য চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছি, ভবিষ্যতেও করবো। তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বার্থের জন্যও একটু চিন্তা করতে ক্ষতি কি ?

সুপ্রভা তীক্ষ্নস্বরে বলিল,—অর্থাৎ অত্যাচারীর জয়গান, আর

নির্য্যাতিতের জন্য সহানুভূতি—এ দুই-ই এক সঙ্গে চালাবে তুমি—আশ্চর্য্য তোমার ক্ষমতা বটে!

বিনোদ একথার কোন উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সুপ্রভা হাতের সেলাইটা মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বহুক্ষণ নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল। এই সময়ে নীচে রাস্তার ধারে, তাহাদেরই বাড়ীর দরজায় যে একখানি প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী আসিয়া থামিল, তাহার শব্দ সুপ্রভার কর্ণগোচর হইল না।

একটু পরেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, রুদ্র সাহেব আসিয়াছেন। সুপ্রভা চমকাইয়া উঠিল। দেশের খ্যাতনামা নেতা মিঃ রুদ্র স্বয়ং আসিয়াছেন, অথচ তাহার স্বামী বাড়ীতে নাই! মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া সুপ্রভা ভৃত্যকে কহিল—তাঁকে উপরে নিয়ে এস! এবং নিজে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির মুখে দরজার পাশে অতিথিকে অভ্যার্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইল।

গণপতি উপরে উঠিয়া সম্মুখেই সুপ্রভাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এযে সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী! সুপ্রভাকে ইহার পূর্ব্বেও দুই একবার তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু এমন ভাবে তাহার পরিপূর্ণ রূপতো তাঁহার চোখে পড়ে নাই! নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক আলোকে সুপ্রভার সেই রূপের জ্যোতিঃ প্রৌঢ় গণপতির হৃদয় আজ চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুপ্রভা শোভন ভঙ্গীতে গণপতিকে নমস্কার করিয়া হাসি মুখে কহিল,—আসুন, মিঃ রুদ্র—

সুপ্রভার কণ্ঠস্বরে গণপতির চমক ভাঙ্গিল, অপ্রতিভভাবে একটা প্রতি-নমস্কার করিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গণপতি আসন গ্রহণ না করিয়াই বলিলেন,—বিনোদ বাবু বাড়ীতে নাই বুঝি ?—

—এই মাত্র কোথায় বেরুলেন—ফিরতে হয়ত একটু দেরী হবে, আপনি বসুন—

গণপতি ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—তাইত বড় অসময়ে এসে পড়েছি, আগে থেকে খবর দিতে পারিনি—

গণপতির কুণ্ঠার কারণ বুঝিয়া সুপ্রভা মৃদুস্বরে কহিল,—আপনি যে এই দরিদ্রের কুটারে এসেছেন, এতো আমাদের পরম সৌভাগ্য—

সুপ্রভার সহজ অভ্যর্থনা, ততোধিক তাহার মধুর কণ্ঠস্বরে গণপতি প্রীত হইলেন, তাঁহার মনে যেটুকু দ্বিধার ভাব জাগিয়াছিল, তাহা দূর হইল। গৃহের চারিদিকে একবার চাহিয়া গণপতি কহিলেন,—এ যদি দরিদ্রের কুটীর হয়, মিসেস মিত্র,—তবে ধনীর প্রাসাদও এর কাছে তুচ্ছ! ধনীদের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর-পূর্ণ গৃহসজ্জা অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন সুরুচি ও সহজ সৌন্দর্য্য কোথাও চোখে পড়েনি—!

সুপ্রভা সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল,—এই সামান্য গৃহসজ্জার মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য দেখছেন, এও আমাদের উপর আপনার স্নেহেরই পরিচয়!

তারপর একটু থামিয়া কহিল,—আপনি বোধ হয় জানেন

না, মিসেস রুদ্রের সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল, আমাকে ছোট বোনের মতই তিনি ভাল বাসতেন। আহা, এমন মানুষ আর হয় না, তাঁকে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত—যেন সাক্ষাৎ দেবী মূর্ত্তি—!

বলিয়া সুপ্রভা একটা বিষাদময় নিঃশ্বাস ফেলিল।

পরলোকগতা পত্নীর উদ্দেশে এই শ্রদ্ধানিবেদন গণপতির হৃদয় বোধ হয় স্পর্শ করিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গাঢ় স্বরে তিনি কহিলেন—সে যে আমার কী ছিল, কেমন করে বোঝাব, মিসেস মিত্র! সে গিয়েছে, আমার অর্দ্ধেক শক্তি হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। এখন কেবল কর্ত্তব্যের জন্যই বেঁচে আছি—!

সুপ্রভা নারীসুলভ মমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিল,—আমরাও কতবার আপনার কথাই ভেবেছি। এই বয়সে অমন স্নেহময়ী পত্নীর বিয়োগ, কি নিদারুণ আঘাতই আপনার হৃদয়ে লেগেছে! কিন্তু আশ্চর্য্য আপনার মনের বল, কেউ ঘুণাক্ষরেও তা বুঝতে পারে না।······এখনও দেশের জন্য অকাতরে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আপনি ব্যয় করছেন!

গণপতি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, অবশেষে বিষাদপূর্ণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তুচ্ছ আমাদের দেশপ্রেম, মিসেস মিত্র! স্বাধীন দেশের লোকদের তুলনায় আমরা কত ক্ষুদ্র! দেশব্যাপী এই বিরাট দুঃখদৈন্যের মধ্যেও নিজেদের স্বার্থ নিয়ে আমরা ব্যস্ত, নেতৃত্বলাভের জন্য সকলে উদগ্রীব! অথচ নেতৃত্ব সকলের সাজে না! দু-একজন জন্মান, বিধাতা তাঁদের ললাটে স্বয়ং বিজয়তিলক পরিয়ে দেন। তাঁরা আসেন দিগ্বিজয়

করতে। অক্ষমেরা তাঁদের ঈর্ষা করতে পারে বটে, কিন্তু তাঁদের গতিরোধ করতে পারে না,—তবু দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই!

সুপ্রভা মৃদু হাসিয়া বলিল,—আপনার ললাটেও বিধাতার সেই বিজয়তিলক আঁকা আছে, আপনিও এসেছেন দিগ্বিজয় করতে—

সুপ্রভার মুখে নিজের এই গুণগান শুনিয়া গণপতি মনে মনে খুবই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু বাহিরে অত্যন্ত বিনয় ও সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন,—এ আপনার নিছক অত্যুক্তি, মিসেস মিত্র! আমার তেমন কোন শক্তিই নাই। দেশের লোক দয়া করে আমাকে সেবার অধিকার দিয়েছে ব'লেই আমি সাহস করে কাজে নামি!

—নিজেকে অত ছোট করে দেখবেন না, মিঃ রুদ্র। আপনি নিজের শক্তির পরিমাণ না জান্‌তে পারেন, কিন্তু দেশের লোক জানে—

গণপতি একথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনস্কভাবে ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরে কহিলেন—একটা কথা আমার কি মনে হয় জানেন, মিসেস মিত্র? আমাদের দেশে নারীশক্তি সুপ্ত, তাই পুরুষের শক্তিও পঙ্গু! এদেশের নারীরা যদি কাজে নামতেন, তবে তাঁদের বিদ্যুৎস্পর্শে জড়দেহও চঞ্চল প্রাণময় হয়ে উঠত—

সুপ্রভা গণপতির মুখের উপর তার গভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল,—সত্যি আপনি নারীশক্তিতে বিশ্বাস করেন, মিঃ রুদ্র?—

—করি, কেননা নিজে প্রতিপদেই তার অভাব অনুভব করছি,—মরিচাধরা তরবারির মত আমাদের সমস্ত বলবুদ্ধির

বৃথা অপচয় হচ্ছে! হিন্দুরা নারীকে শক্তিরূপিনী বলেছেন। সেটা যে রূপক নয়, পাশ্চাত্য দেশ তা হাতেকলমেই প্রমাণ করে দিয়েছে; আর আমরা সেটা অপ্রমাণ করবার জন্যই যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চেষ্টা করে এসেছি!

সুপ্রভা বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিল।

গণপতি পুনরায় কহিলেন,—এই ধরুন, আপনার মত শক্তিশালিনী নারী যদি কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ান, তবে দেশ শতাব্দীর পথ একদিনেই অতিক্রম করবে! বিধাতা আমার ললাটে বিজয়তিলক পরিয়ে দিন আর না দিন, আপনার মত মেয়েকে যে কেবল ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ রাখবার জন্য পাঠাননি, তাতে কোন সন্দেহ নেই—

গণপতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া সুপ্রভা কহিল,—একি আপনার অন্তরের কথা, মিঃ রুদ্র? কিন্তু যেদিন সত্যই নারীরা দেশের কাজে নামবে, সেদিন কি আপনারা তা সহ্য করতে পারবেন?

—সে দিন আমি মনে করবো, তিমির রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, পূর্ব্বাকাশে অরুণরাগ-রেখা দেখা দিয়েছে!

গণপতির স্বর গম্ভীর, ঈষৎ আবেগকম্পিত।

সুপ্রভা মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, অবশেষে যেন একটা দ্বিধার ভাব মন হইতে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—আজ তবে আপনাকে একটা গোপন কথা বলি, যা আর কাউকে বলিনি। দেশের কাজ করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা

আমারও মনে আছে,—আর সেই উদ্দেশ্যে একটা নারী প্রতিষ্ঠান গড়বার কল্পনাও করেছি—

গণপতি উল্লসিত ভাবে কহিলেন—শুধু কল্পনা নয়, মিসেস মিত্র! কল্পনা যাতে কাজে পরিণত হয়, তাই দেখ্‌তে চাই—!

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গণপতি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আমি তো চা বেশী খাই না—

সুপ্রভা নিজের হাতে চা ঢালিয়া গণপতির সম্মুখে রাখিয়া বলিল,—তবু আজ আমার আতিথ্যের এই সামান্য উপদ্রবটুকু আপনাকে সহ্য করতে হবে—!

সুপ্রভার মৃদুহাস্যরঞ্জিত সুন্দর মুখ ও শুভ্র মল্লিকার মত বাহুযুগলের দিকে চাহিয়া গণপতির ক্ষীণ আপত্তিটুকু আর মাথা তুলিতে সাহস পাইল না।

একটু পরে চায়ের পাত্র নামাইয়া রাখিয়া গণপতি বলিলেন,—আপনার মত আর পাঁচটী মেয়েও যদি দেশে থাকত, তবে আমাদের বুকের বল দশগুণ বেড়ে যেত—

সুপ্রভা ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলিল,—কেবল মুখের প্রশংসা নয়, মিঃ রুদ্র,—আপনাকে আমার কাজেও সাহায্য করতে হবে!

গণপতি সোৎসাহে কহিলেন,—নিশ্চয়ই করবো! আমার স্বপ্নকে আপনি রূপ দিতে চাইছেন,—সুতরাং এতো আমারই নিজের কাজ।...কিন্তু আজ আর নয়, উঠি,—মিঃ মিত্রকে আমার নমস্কার জানাবেন—

বলিয়া গণপতি সুপ্রভার দিকে মুহূর্ত্তকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ধীরে ধীরে আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

অসীম যখন বাড়ীতে ফিরিল, তখন বেলা প্রায় ১০টা
বাড়ীখানি নিঝুম নিস্তব্ধ, অসীমের মনে হইল, যেন আগ্নেয়গি
অগ্নি উদগীরণ করিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ শান্তভাব ধারণ করিয়া
অথবা ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেন নিস্তব্ধ হইয়াছে! কাকীম
ক্রুদ্ধমূর্ত্তি ও তীক্ষ্ণরসনা কল্পনা করিয়া এই শিক্ষিত বং
ছেলেটারও বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। কাকাবাবুর দি
হইতে বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই, সে বিষয়ে সে নিশ্চি
ছিল। তবু একবার জুতা খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে
ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, বিশ্বপতি কতকগুলি পুঁথিপত্র লই
তন্ময় হইয়া আছেন, কাণের কাছে ঢাক পিটিলেও তাঁহ
বাহ্য চৈতন্য হইত কিনা সন্দেহ! এই ধ্যানমগ্ন কর্ম্মযোগ
প্রশান্ত মূর্ত্তির দিকে অসীম কয়েক মুহূর্ত্ত সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহি
রহিল। এমন নীরব কর্ম্মী সে কমই দেখিয়াছে,—দেশ
সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসা ইঁহারই জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে
অসীম যদি এই জীবন্ত আদর্শের বিন্দুমাত্রও অনুসরণ করি
পারিত, তবে সে ধন্য হইত!

অসীম অন্দরের দ্বারের নিকট আসিয়া একবার ইতস্ত
করিল। তারপর, যেন কিছুই হয় নাই, এইমাত্র খানিক
বেড়াইয়া সে ফিরিয়া আসিল, এমনই ভাবে গুণ গুণ করিয়া
একটা গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

অসীম উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—কাকীমা—!

কাকীমা তখন রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতে-ছিলেন। অসীমের ডাক শুনিয়া তাহার দিকে গম্ভীরভাবে বক্র দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন মাত্র, কোন সাড়া দিলেন না, তাঁহার হাত আলুর খোসা ছাড়াইবার কাজে সমানভাবে ব্যস্ত রহিল।

অসীম প্রমাদ গণিল। সে ভাবিয়াছিল, কাকীমা তখনই ...হার উপর প্রবল বাক্যবাণ বর্ষণ আরম্ভ করিবেন, তাহার ...নাচারে যে তাঁহার হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল, অতীত ও ...মানের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাহা প্রমাণিত করিবেন এবং এ কয়দিন তাহার নিরুদ্দেশ হওয়ার ফলে তিনি যে দিবারাত্র কিরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগে কাটাইয়াছেন, তাহারও একটা সুদীর্ঘ বর্ণনা দিবেন। অসীম নিজে যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, তাহা সে জানিত। বাড়ীর কাহাকেও ...ান কিছু না বলিয়া এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ার যত বড় ...বার্য্য কারণই থাক, তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য ..., ইহাও বুঝিতে পারিতেছিল। সুতরাং স্বকৃত অপরাধের ...স্তি গ্রহণের জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

কিন্তু কাকীমা তাহাকে তিরস্কার করা দূরে থাকুক, তাহার ডাকে সাড়া পর্য্যন্ত দিলেন না। তাঁহার এই নূতন ভাবের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

ইহাতে সে প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া উঠিল! বুঝিল, ব্যাপার একটু বেশী দূর গড়াইয়াছে।

তবু জোর করিয়া মুখে খানিকটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,—কি কাকীমা, শুনতে পাচ্ছনা? কি হয়েছে তোমার?

কাকীমা এবারও কোন কথা বলিলেন না, গম্ভীরভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অসীম আপন মনেই কহিতে লাগিল,—তোমাকে ব'লে যাবার সময় পেলাম না, সুবোধ জোর করে ধরে নিয়ে গেল, কাপড়টা পর্য্যন্ত বদলাতে পারলাম না। বেচারার মা মরেছে, তার সৎকার হয় না,—কি করি—

কাকীমা যেন কিছুই শুনিতেছেন না, এমনই ভাব দেখাইলেন।

অসীম একটা ঢোক গিলিয়া পুনরায় কহিল,—ওদের গ্রামে গিয়ে যে তোমাকে একটা চিঠি লিখব বা তার করবো, তার উপায়ও ছিল না, হতভাগা গ্রামে একটা ডাকঘর পর্য্যন্ত নেই—

কাকীমা তখন তরকারী কুটা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অসীমের দিকে ঈষৎ ঘাড় ফিরাইয়া তীক্ষ্নস্বরে কহিলেন,—আমি তোমার কে যে, আমাকে তার করতে যাবে! দাসীবাঁদীর মত মানুষ করেছি বইত নয়—! এখন বড় হয়েছ, লেখা পড়া শিখেছ, এখন আর আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? দিল্লীই যাও, আর লঙ্কাই যাও, আমাকে খবর দেবার তো কোন দরকার নেই!—থাকতো তোমার মা বাপ, তাদের না বলে যেতে পারতে না,—যেখানে খুসী মুচী মুদ্দোফরাসের কাজ করে বেড়াবার সাহসও হত না—

বলিয়া কাকীমা গজেন্দ্রগমনে রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

. অসীম কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে প্রাঙ্গনেই দাঁড়াইয়া রহিল, কাকীমার এই দুর্ভেদ্য অভিমানের প্রাচীর কি করিয়া ভাঙ্গিবে

ভাবিয়া পাইল না। হঠাৎ মাথায় একটা ফন্দী আসিল,—এবার সে শেষ সম্বল পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, যদি কোন ফল হয়—!

রান্নাঘরের বারান্দায় উঠিয়া দরজার সম্মুখে গিয়া সে বলিল,—অপরাধের বিচার পরে হবে, কাকীমা! আপাততঃ কিছু খাবার যোগাড় কর। এ তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় গেছে বললেই হয়, খিদেয় পেট জ্বলছে, মাথাটাও ঝিম ঝিম করছে—

কাকীমার হাত হইতে লোহার বেড়ীটা সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। চীৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া তিনি বলিলেন,—আমি আগেই তা ভেবেছি! এমনি ক'রে না খেয়ে দেয়ে, বনেজঙ্গলে ঘুরে মরবে হতভাগা! আর তারাই বা কেমন লোক! ভদ্রলোকের ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেলি, খেল না খেল দেখাশোনা নেই, যত্ন আর্ত্তি নেই! এখন একটা কঠিন অসুখ হয়ে পড়ুক, আর তাই নিয়ে আমি ভুগে মরি। হা আমার অদৃষ্ট!

বলিয়া কাকীমা কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

অসীম বুঝিল, পাশুপত অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হয় নাই। তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে নামিয়া বলিল,—আমি স্নানটা সেরে নেই, কাকীমা, তুমি ততক্ষণ জায়গা কর।

স্নান করিয়া আসিয়া অসীম খাইতে বসিলে, কাকীমা গম্ভীরভাবে তাহার সম্মুখে বসিলেন। অন্য দিন তিনি এমন সময় অনর্গল বকিয়া যাইতেন, প্রতিকাজে অসীমের বুদ্ধিহীনতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেন। অসীম তাঁহার কথা কতক শুনিত, কতক বা শুনিত না, কিন্তু অধিকাংশ কথারই জবাব দিত না। কাকীমা তাহাতে নিরুৎসাহ হইতেন না, তাঁহার রসনা

সমান বেগে চলিত। কিন্তু আজ তিনি আশ্চর্য্যরূপে নীরব রহিলেন দেখিয়া অসীম একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই উঠিল,—কাকীমার দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য বলিল,—

—আজ যে রান্না হয়েছে কাকীমা, ঠিক যেন অমৃত! তিন দিন বাড়ীতে ছিলাম না, মনে হচ্ছে, যেন কত কাল তোমার হাতের রান্না খাইনি!

কাকীমা তাড়াতাড়ি আর খানিকটা ব্যঞ্জন অসীমের পাতে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন,—চিরকালতো আর অমৃত পরিবেশন করবার জন্য আমি বেঁচে থাকবো না! কতবার বলেছি, একটা লক্ষ্মী গেরস্তর মেয়ে ঘরে আন্, তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাই—

অসীম কাকীমার কথার ঈঙ্গিত না বুঝিবার ভান করিয়া বলিল,—ভাল গেরস্তর মেয়ে রাঁধুনী আর কোথায় পাওয়া যায়, কাকীমা। কাউকে বিশ্বাস ক'রে বাড়ীতে স্থান দেওয়াও যায় না, ও সব ঝঞ্ঝাটে কাজ কি?

কাকীমা গালে হাত দিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অসীমের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ক্ষুব্ধ অভিমানের স্বরে বলিলেন,—তোর কি আর কোনকালে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না? আমি কি রাঁধুনী রাখবার কথা বল্‌ছি। আমাকে একটী লক্ষ্মী বৌ এনে দিতে হবে! এই বুড়ো মানুষকে চিরকাল খাটিয়ে মারবি—আমারও তো একটু বিশ্রাম চাই—!

অসীম যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল,—ও তোমার সেই পুরাণো কথা! কিন্তু আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, কাকীমা, বিয়ে আমি এখন করবো না, করতে পারবো না?

—তবে কি এমনই ছন্নছাড়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ? এত লেখাপড়া শিখে শেষে এই বুদ্ধি হল ?

অসীম হাসিয়া বলিল,—লেখাপড়া শেখাটা কি বিয়ের জন্য, কাকীমা ? একটী নোলকপরা কচিমেয়ে পেলে তুমি খুসী হ'তে পার, কিন্তু আমার যে সে-কথা মনে করতেই ভয় হয়—!

কাকীমা গালে হাত দিয়া বলিলেন,—ওমা, সে কি কথা ! বিয়ে করতে বেটাছেলের ভয়, এতো কখনো শুনিনি ! যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড—!

একটু থামিয়া, কি ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন,—আমি যে বৌ ঠিক করেছি, সে পাড়াগেঁয়ে মুখ্‌খু সুখ্‌খু নয় রে,—আমাদের সবিতার মতই লেখাপড়া জানা সহুরে মেয়ে—দেখতেও অপরূপ সুন্দরী !

—রক্ষা কর কাকীমা, সেই সুন্দরী বিদূষী যেখানে আছেন থাকুন, বা অন্য যেখানে ইচ্ছা যান, কিন্তু আমাদের এখানে তাঁর শুভাগমন ক'রে কাজ নেই ! সত্যি আমি বিয়ে করবো না, কাকীমা—

—তা' আর করবে কেন ! আমি মরে গেলে তখন তুমি বিয়ে করবে ! যেমন আমার পোড়াকপাল, কোন সাধ আহ্লাদ জীবনে পূর্ণ হ'ল না, এটাই বা হবে কেন ?

বলিতে বলিতে কাকীমার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি ঘন ঘন আঁচল দিয়ে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

এ আকস্মিক করুণরসের আবির্ভাবে অসীম অপ্রতিভ

হইল। সে আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিল।

কাকীমা কিন্তু এইখানেই নিরস্ত হইলেন না। বিশ্বপতির পড়ার ঘরে হানা দিয়া কহিলেন,—অসীম বাড়ীতে ফিরেছে, শুনেছ ?

বিশ্বপতি গভীর নিবিষ্টচিত্তে লিখিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—গিয়েছিল কোথায় ?

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন,—বাড়ীর কর্ত্তা এমন না হলে কি আর ছেলেটার ওই দশা হয়! ও মরলো কি বাঁচলো, তার কোন খোজ রাখাও তুমি দরকার মনে কর না—

বিশ্বপতি এবার কলম থামাইয়া প্রশান্তভাবে হাসিয়া বলিলেন,—ওর খোজ রাখবার ভার তো তোমার উপর, তোমারই ছেলে—!

তুফান খুবই জোরে উঠিতেছিল, এই মন্ত্রপ্রয়োগে তাহা একটু শান্ত হইল। কণ্ঠস্বর এক পর্দ্দা নীচে নামাইয়া গৃহিণী কহিলেন,—রাতদিন ভবঘুরে বৃত্তি করে বেড়ায়, ঘবে ওর মন বসে না, তা কি তুমি দেখতে পাও না! কতদিন থেকে বল্‌ছি, একটা ভাল মেয়ে খুজে ওর বিয়ে দাও,—যে বয়সের যা ধর্ম্ম! তা তোমার গ্রাহ্যই হয় না। কি যে ছাই পাঁশ কাজে ব্যস্ত—যাকে ব'লে ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো! এদিকে সংসারের ভাবনা ভাবতে আমার হাড় কালি হয়ে গেল—!

বিশ্বপতি চমকিতভাবে বলিলেন,—অসীমের বিয়ে—এত শীগ্‌গির ? ও তো বিয়ে করতে চায় না !

—ছেলেরা অমন ব'লেই থাকে, আবার বৌ পেলে ভুলে যায়। ওর কথা তুমি ধরো' না—

একটু থামিয়া গৃহিণী পুনরায় কহিলেন,—ওযে অনেক সময় সবিতাদের বাড়ীতেই থাকে, তার সঙ্গে গল্প করে কাটায়, সে খবর রাখ ?

বিশ্বপতি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন;—সবিতা বড় ভাল মেয়ে, গণপতির সৌভাগ্য যে এমন মেয়ে পেয়েছে। অসীম আর সবিতা ঠিক যেন দুই ভাই বোন,—ছেলেবেলা থেকেই ওদের ভাব—

গৃহিণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন,—এখন তো আর ওদের ছেলেবেলা নেই,—এখন অত বড় আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে অসীম বেশী মেলামেশা করে, এ আমি পছন্দ করি নে ! সেইজন্যই আরো ওর বিয়ে দিতে চাই—

বিশ্বপতি অবাক হইয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন তিনি তাঁহার কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তার পর হঠাৎ কি যেন একটা অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এই ভাবে কহিলেন,—সবিতার সঙ্গে অসীমের বিয়ে দিলে তুমি খুসী হও, নয় ?

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—কি যে বুদ্ধি, শালুক চেনেন গোপালঠাকুর ! বড় লোকের বাবু মেয়ে ঘরে এনে আমি কি ধুয়ে খাব ? আর

তার বাপই বা এমন গরীবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে যাবে কেন ?

বিশ্বপতি ভাবিয়াছিলেন, প্রস্তাবটা শুনিয়া গৃহিণী খুব খুসী হইবেন। কিন্তু ফল তাহার বিপরীত হইল দেখিয়া অপ্রস্তুতভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। এই নারীটার সঙ্গে তিনি বহুকাল হইল ঘর করিতেছেন, তবুও এখনো ইহার মনের কুলকিনারা খুঁজিয়া পাইলেন না! ইহার চিত্তাকাশে কখন রৌদ্র, কখন বা মেঘের সঞ্চার হয়, তাহা তিনি ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

গৃহিণী স্বামীর অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া তাঁহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্দরে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বপতি চিন্তান্বিতভাবে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে অসীম কোথায় বাহির হইতেছিল, বিশ্বপতি তাহাকে ডাকিলেন।

—তুমি পাঞ্জাবের একটা কলেজে কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিলে, নয় ? তার কি হ'ল ?

অসীম মাথা নত করিয়া বলিল,—কাজ পেয়েছিলাম, কিন্তু বাঙ্গলা ছেড়ে আমি পাঞ্জাবে যেতে চাই নে—

বিশ্বপতির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন,—পাঞ্জাবের চেয়ে বাঙ্গলায় কি চাকরীর সমস্যা বেশী সহজ ?

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল,—আজ্ঞে, তা নয়। কিন্তু বাঙ্গলাদেশেরই দাবী আমার উপর সর্ব্বাগ্রে। আমি এই বাঙ্গলারই সেবা করতে চাই, সেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা—!

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন,—অবশেষে অসীমের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—আমি ছেলেবেলা থেকে তোমাকে স্বাধীনভাবে মানুষ করতেই চেষ্টা করেছি, তোমার বুদ্ধির উপর জোর ক'রে নিজের ইচ্ছা চাপাতে চাইনি। কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ তোমার কথার সম্পূর্ণ অর্থ কি ?

অসীম কোন উত্তর দিল না, পূর্ব্ববৎ মাথা নত করিয়া রহিল।

বিশ্বপতি কহিতে লাগিলেন,—দেশসেবার অর্থ—স্বেচ্ছায় দুঃখ দারিদ্র্য বরণ করা, ধনমান যশ প্রতিষ্ঠার লোভ ত্যাগ করা; যদি সে দুর্গম পথে চল্‌তে না পার, তবে আর দশজনে যে বাঁধা রাস্তায় চলেছে, তাই ধরে' চল। এই দুয়ের মধ্যে কোন আপোষ হ'তে পারে না।

একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন,—যৌবনে তোমার মত দেশসেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমারও ছিল। কিন্তু আজ দেখছি, সে ব্রত পালন করবার মত শক্তি আমার নেই। আমার দুর্ব্বলতাই আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। পাছে, তুমিও ভাল ক'রে না বুঝে এই দুর্গম পথের যাত্রী হও, সেইজন্যই এ সব কথা বলছি, তোমার সঙ্কল্পকে বাধা দেবার জন্য নয়—!

অসীম মৃদুস্বরে কহিল,—নিজের শক্তি সম্বন্ধে আমার কোন ভুল ধারণা নেই। আমার একমাত্র সাহস, আপনার কাছেই দেশসেবার দীক্ষা নেব, আপনিই আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন—

বিশ্বপতি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, তারপর অসীমকে লক্ষ্য করিয়া শান্ত-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—দেশের লোককে,

সেবা করাই দেশসেবার স্বরূপ। এই যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মূর্খ, কুসংস্কারান্ধ, দরিদ্র—অশেষ দুর্দ্দশার মধ্যে বাস করছে, তাদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে পারবে তুমি ?

অসীম দৃঢ় স্বরে বলিল,—আমি তাই করতে চাই !

—শুধু মুখে বল্‌লে হবে না,—সমস্ত ব্যাপারটা ভাল ক'রে ভেবে দেখ ! সহর থেকে দূরে দরিদ্র পল্লীতে গিয়ে তাদেরই মধ্যে থাকতে হবে,—দুঃখ দারিদ্র্য ব্যাধি তাদেরই মত স্বীকার করে নিতে হবে। দিনের পর দিন অটল ধৈর্য্যের সঙ্গে তাদের সেই দুর্ভাগ্য জীবনের মলিন দৃশ্য সহ্য করতে হবে ! তিন দিন সময়, তারপর আমাকে উত্তর দেবে !

অসীম কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন চাপরাস-আটা ভৃত্য আসিয়া বিশ্বপতির হাতে একখানা পত্র দিল। পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বিশ্বপতির মুখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর গভীর বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া পত্রখানি অসীমের হাতে দিলেন।

অসীম ভৃত্যকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল, পত্র গণপতির নিকট হইতে আসিয়াছে। তাহার মন উদ্বিগ্ন হইল, তারপর পত্র পড়িবার সময় গণপতির মুখের ভাব দেখিয়া সেই উদ্বেগ অধীরতায় পরিণত হইল। অবশেষে বিশ্বপতি যখন পত্রখানি তাহারই হাতে দিলেন, তখন তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সে স্তম্ভিত, বেদনাহত, হতবুদ্ধি হইল। কথাগুলি সত্যই পত্রের মধ্যে লিখিত আছে কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য সে বারবার পত্রখানি পড়িল।

অসীমের এই ভাব বিশ্বপতির দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ধীর স্বরে কহিলেন,—হঠাৎ গণপতির এই উত্তেজনার কারণ কি জান, অসীম ?

অসীম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—আপনি যাতে সঙ্ঘের নির্ব্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান, তাই করতে জ্যাঠামশায় আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি স্বীকার করিনি—

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—ও, এই! এখনও সেই ছেলে বেলার গণপতি! ওর শক্তি অসাধারণ, ওর মত কর্ম্মী দেশে খুব কমই আছে। কিন্তু ও চায়, সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করতে, কারু বাধা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।······তুমি গণপতিকে বলো,—এই সভাপতি-পদের জন্য আমার নিজের কোনই আগ্রহ নেই,—এর জন্য কাউকে অনুরোধও করবো না। তবে লোকে যদি স্বেচ্ছায় আমাকে এ পদে বরণ করে, তা আমি অস্বীকারও করবো না—!

—কিন্তু জ্যাঠামশায় তো আমার বল্‌বার কোন সুযোগ রাখেন নি—

—ও,—বুঝেছি, তোমাকে তার বাড়ীতে যেতেই নিষেধ করেছে! কিন্তু এ রাগ ওর বেশী দিন থাকবে না, মন একটু শান্ত হইলেই নিজের অন্যায় বুঝতে পারবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—সবিতার কথা যা লিখেছে, ওটা কিন্তু ঠিক মনে হয় না। সবিতা বড় লক্ষ্মী মেয়ে, সে এমন কথা বল্‌তেই পারে না—!

অসীম ইহার কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বপতির নিকট হইতে মুক্তি পাইয়া অসীম যখন বাহিরে আসিল, তখনও পত্রখানি তাহার হাতেই ছিল। তাহার মনে হইল, এ পত্র নয়, গণপতির নিক্ষিপ্ত একটা বিষদিগ্ধ শর! গোটা কয়েক অক্ষর যে মানুষের মনে এত জ্বালা বহন করিয়া আনিতে পারে, তরুণ অসীম তাহার জীবনে এই প্রথম তাহা অনুভব করিল। অসীম গণপতির অনুরোধ রাখে নাই, সেজন্য তাঁহার বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিরক্তি যে এমন বিদ্বেষে পরিণত হইতে পারে, ইহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই!

অসীম মনে মনে গণপতি ও বিশ্বপতি এই দুইজনের চরিত্রের তুলনা না করিয়া পারিল না। দুইজনে আবাল্য বন্ধু, অথচ ইঁহাদের প্রকৃতির মধ্যে কি গভীর পার্থক্য! বিশ্বপতি ধীর, স্থির, প্রশান্ত,—কোন কিছুতেই উত্তেজিত হওয়া তাঁর স্বভাব নয়, জয় পরাজয়েও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই,—যেন এ সবে তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। আর গণপতি নিজের পরাজয়ের কল্পনাতেই অধীর হইয়া উঠিয়াছেন! বিশ্বপতি দরিদ্র, দেশের লোকের নিকট অর্থ, যশ বা সম্মান কোন দিনই তিনি প্রত্যাশা করেন না। আর গণপতি যশের মুকুট পরিয়া, ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও আরো বেশী পাইবার জন্য লালায়িত!

গণপতির কথা ভাবিতেই, সঙ্গে সঙ্গে সবিতার চিন্তা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত অসীমের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। সবিতা কি এ পত্রের কথা জানে? জানিয়াও কি সবিতা ইহার বিরুদ্ধে কোন

প্রতিবাদ করে নাই ? সবিতার এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য অসীমের মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না। সেই দিন সকালেই সে সবিতার হৃদয়ের, যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তাহাদের এতদিনের বন্ধুত্বের কোন মূল্যই কি নাই ?—মানুষ কি এক মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত অতীত ভুলিয়া যাইতে পারে ?

......কিন্তু যদিই বা সত্য হয়, আবাল্য বন্ধুত্বের চেয়ে, ধন মান অভিজাত্যগর্ব্বই সবিতার নিকট বড় হয়, তাহা হইলেই বা অসীমের ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের কারণ কি ? অসীম সবিতার নিকটে কোন দিন কিছু প্রত্যাশা করে নাই,—আজও করিবে না। জীবন প্রভাতে একদিন যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে যদি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চিরকালের মত দূরে সরিয়া যায়, অসীমের তাহাতে কিই বা করিবার আছে ! ধনীর দুলালী সবিতার সঙ্গে তাহার ন্যায় দরিদ্রের বন্ধুত্ব কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

অসীম দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিলাপ করিবে না, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মের মধ্যে সে আপনাকে ডুবাইয়া দিবে, দেশের কাজে আত্মদান করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে,—আর দূর হইতেই সবিতার সৌভাগ্যে আনন্দ অনুভব করিবে।

অসীম এই সব চিন্তায় এতই বিভোর ছিল যে, রাজপথের জনতা, অথবা যানবাহনের ভীড়ের দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না। শোভা-বাজারের মোড় ঘুরিতেই একটী যুবক একখানা গাড়ী হইতে নামিয়া যখন সহসা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া "অসীম-অসীম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন অসীম কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।

যুবক উচ্চহাস্য করিয়া বলিল,—কি হে, মোটেই চিন্‌তে পাচ্ছ না যে,—'কবিকে' এর মধ্যেই ভুলে গেলে! তোমার স্মৃতিশক্তির তারিপ করতে হয়—!

অসীম স্বপ্নোত্থিতের মত দুই চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিল,—কে, অতুল নয়,—কি আশ্চর্য্য, তুমি এখানে—!

অতুল হাসিয়া বলিল,—বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতার 'পথে আমার উপস্থিতিটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়, আশ্চর্য্য তোমারই ভাবভঙ্গী! একেবারে কোন খেয়াল নাই তোমার, আর একটু হলেই গাড়ীচাপা দিয়েছিলাম আর কি! ব্যাপারখানা কি বল তো খুলে, কোন তরুণীর প্রেমে পড়েছ নাকি—

—তুমি যখন কবি, তখন সব রকম উদ্ভট কল্পনা করবারই অধিকার তোমার আছে। কিন্তু কবি যা কল্পনা করেন, তাই তো আর সত্য নয়! তরুণীর প্রেম ছাড়াও জীবনে আরো অনেক গুরুতর সমস্যা আছে—

—সে সব গুরুতর সমস্যার মীমাংসায় কবির কোন আগ্রহ নেই, মিউনিসিপালিটির কাউন্সিলার এবং শেয়ার বাজারের মহাজনেরাই তা করুন। কিন্তু সত্যি ক'রে বল দেখি, তোমার খবর কি, কোথায় আছ, কি করছ এখন—?

অসীম হাসিয়া বলিল,—আমিও তো তোমাকে ঠিক ঐ সব প্রশ্নই করতে পারি! আমার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানবার নেই, অর্থাৎ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করেছি। কিন্তু তুমি কবি, তোমার জীবন রহস্যময়। তোমার সেই প্রেমের অভিযানের কাহিনীও আমি ভুলিনি।

কতবার কৌতূহল হয়েছে, তোমার সেই সুন্দরী বিদুষী পত্নীটীকে দেখতে, কি গুণে যে আমার কবি বন্ধুটীর চিত্ত তিনি এমন করে জয় করেছেন, তা জানতে—

—সে কৌতূহল তো এই মুহূর্ত্তেই চরিতার্থ করতে পার! একটু কষ্ট ক'রে এই মোড়টা ঘুরে আমার সঙ্গে চল, তোমাকে একেবারে সেই সুন্দরী বিদূষীর দরবারে নিয়ে হাজির করবো—

অসীম কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে অতুলের মুখের দিকে চাহিল।

অতুল উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—তামাসা নয়, সত্যি বল্‌ছি। এই কাছেই আমার বাড়ী, তোমারও বোধ হয় ভবঘুরে-গিরি করা ছাড়া হাতে এখন কোন কাজ নেই, চল—

অতুল প্রায় জোর করিয়াই অসীমকে টানিয়া লইয়া চলিল। অসীমও আপাততঃ দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার একটা সুযোগ পাইয়া বিশেষ কোন আপত্তি করিল না।

সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে ছোট একখানি বাড়ী। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া নাড়িতেই কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিয়া গেল এবং 'কবিপত্নী' মাধুরী সম্মুখে আসিয়া অতুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—ও, তুমি!—আজ যে বড় সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই বাড়ী ফিরলে—!

—যদি বলি তোমার জন্যই ফিরেছি, তাহ'লে তুমি বিশ্বাস ক'রবে না। কিন্তু কথাটা একটুও মিথ্যা নয়! আর আমি একা আসিনি, সঙ্গে আর একজনকেও নিয়ে এসেছি। ইনি

শ্রীমান অসীমচন্দ্র, কেবল আমার বন্ধু নন, তোমারও একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত—

মাধুরীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। একজন অপরিচিতকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় টানিয়া দিল।

অসীমও ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল,—কিযে তুমি বল, অতুল, তার ঠিক নেই! আপনি কিছু মনে ক'রবেন না, বৌদি,—আমার এমন ধৃষ্টতা নাই যে—

অসীমের কথার মধ্যে এমন একটা অকুণ্ঠ সহজ সরলতা ছিল যে, মাধুরীর সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তেই দূর হইল, স্নিগ্ধহাস্যে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অসীমকে একটা নমস্কার করিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল,—ভিতরে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে চুলচেরা তর্ক ক'রে কোন পক্ষেরই লাভ নেই!

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নিশাকর তখনও আকাশে দেখা দেন নাই, কেবল কয়েকটী নক্ষত্র তাহাদের ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিয়া আসর জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সঙ্কীর্ণ বাড়ীটার চারিদিকেই প্রায় রুদ্ধ, কেবল দক্ষিণদিক একটুখানি খোলা এবং সেই পথ দিয়াই সন্ধ্যার শীতলবাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। ঘরের সম্মুখে ছোট একটা বারান্দা। সেইখানে অসীমকে বসাইয়া, অতুল মাধুরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

তুমি অসীমকে জান না মাধুরী! কিন্তু একসময়ে ওর চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর ছিল না। ওর কাছে আমি যত ঋণী, জীবনে এমন আর কারু কাছেই নই। প্রথম

যৌবনে যখন বাণীর সাধনা আরম্ভ করেছিলাম, তখন বন্ধুদের কাছে পুরস্কার পেয়েছিলাম—বিদ্রূপ! তাই আমার গোপন সাধনা যখের ধনের মত ভয়ে ভয়ে লুকিয়েই রাখতাম, প্রকাশ করতে সাহস পেতাম না। অসীমই এই অখ্যাত অজ্ঞাত কবিকে প্রথমে লোকসমাজে প্রচার করে দিল। আমার কবিতা শোনবার ওর ধৈর্য্য ও উৎসাহের অন্ত ছিল না, বোধ হয় আমার চেয়েও আমার কবিতাকে ও ভালবাসত বেশী—

বলিয়া অতুল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

অসীমও হাসিয়া বলিল,—ঠিক কথাই বলেছে, বৌদি। ওর চেয়ে ওর কবিতাকেই আমি বেশী ভালবাসতাম! কারণ ওর মধ্যে ভালবাসবার কিছু ছিল না, ও একেবারে সেই আদিমযুগের বর্ব্বর, পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় আফ্রিকার জঙ্গলে, বা হিমালয়ের গুহায় বাস করত। কিন্তু ওর কবিতা একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

—পাষণ্ড, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীর নিন্দা! পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামীর নিন্দা শুনতে নেই, তা জান,—এখনই উনি হয়ত কাণে আঙ্গুল দেবেন—

—অর্থাৎ স্বামীকে নিন্দা করবার পবিত্র অধিকার একমাত্র পতিব্রতা সহধর্ম্মিনীরই আছে, অন্য কাউকে সে-অধিকার ছেড়ে দিতে তাঁরা রাজী নন—

বলিয়া অসীম হাসিতে লাগিল।

মাধুরী কিন্তু এ সব কথায় তেমন মনোযোগ দেয় নাই; অসীমের নাম শুনিয়াই সে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। এই

কি সেই অসীম,—গণপতির মুখে যাঁর নাম সে শুনিয়াছিল ? সবিতার সঙ্গে এঁর পরিচয় কি খুব ঘনিষ্ঠ—উভয়ের মধ্যে কি কোন হৃদয়ের যোগ আছে ? সেদিন অসীমের কথা উঠিতেই সবিতার কপোলে যে রক্তিমাভা, নয়নে বিদ্যুৎদীপ্তি দেখিয়াছিল, মাধুরী এখনও তাহা ভুলিতে পারে নাই।

প্রকাশ্যে মৃদু হাসিয়া মাধুরী বলিল,—সে-অধিকার আপনিও ভাগ করে নিতে পারেন, অসীমবাবু,—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কেন-না, আমি সেকালের আদর্শ হিন্দুনারী নই, সম্পূর্ণ একালের! আমার বন্ধু সবিতা দেবী বলেন, কবিরা অসাধারণ জীব, তাঁরা সাধারণ মানুষের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পারেন না। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয়, তা আমি ভাল ক'রেই বুঝেছি—

বলিয়া একবার অপাঙ্গে স্বামীর দিকে চাহিল।

অসীম চমকিত ভাবে বলিল,—সবিতা দেবী ? কোন সবিতা দেবী ?—গণপতি বাবুর মেয়ে ? তাঁকে আপনি চেনেন না কি ?

—সে যে আমার বাল্যবন্ধু সহপাঠী—!

অসীমের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, চোখে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। এতক্ষণ যে-সব কথা সে ভুলিয়াছিল, সেই গুলিই কাঁটার মত মাথা তুলিয়া তাহার অন্তরকে পীড়িত করিতে লাগিল। অসীমের এই ভাবান্তর মাধুরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার মনে একটা অস্পষ্ট সংশয়ের রেখা পড়িল।

কিন্তু পূর্ব্ববৎ সহজভাবেই সে বলিল,—সবিতার মুখে আপনার প্রশংসা আর ধরে না, ও আপনাকে একটা ছোটখাট

অবতার বলেই মনে করে! ওর মুখেই শুনলুম, দেশের কাজে আপনি আত্মোৎসর্গ করেছেন। সেই থেকে আপনাকে দেখবার জন্য আগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু এত শীঘ্র এমন ভাবে যে দেখা হবে, সে কল্পনা করিনি।

—কল্পনা আর সত্য এক নয়, বৌদি! জীবনে অনেক কল্পনাই লোকে করে, যদিও তার অধিকাংশই সফল হয় না। আমারও মনে দেশসেবার অনেক কল্পনা আছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার একটাও কাজে পরিণত করতে পারিনি,—কোন দিন পারবো কিনা জানিনে, হয়ত আগাগোড়া ব্যর্থতার কাহিনী দিয়েই এ জীবনের ইতিহাস রচিত হবে—

বলিয়া অসীম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। মাধুরীর মনে হইল, সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস অসীমের হৃদয়ের কোন গোপন অন্তঃস্থল হইতে বেদনার বাণী বহন করিয়া আনিতেছে।

অতুল মাধুরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—তোমরা যে কেবল তর্কই করছ,—অসীমের জন্য একটু মিষ্টিমুখের আয়োজন কর। নইলে, ও বাড়ী গিয়ে তোমার অতিথি সেবার নিন্দা ক'রবে!

মাধুরী লজ্জিত ভাবে কহিল,—এই যে যাই, বসুন, অসীমবাবু—

অসীম অতুলের কথার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মাধুরী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ তাহার জ্যোৎস্নাধারায় ধরণী প্লাবিত করিয়াছে। সেই চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অসীম ও অতুল দুই বন্ধুতে মিলিয়া তাহাদের পূর্ব্ব জীবনের কত কথাই বলিতেছিল। সে বলার মধ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না,

যেন শুধু বলিয়াই তাহারা আনন্দ পাইতেছিল। মানুষ যখন জীবনের দুঃখকষ্ট সঙ্ঘর্ষের মধ্যে পড়ে, তখন অতীতকে এমনই সুখের মনে হয়; দূর হইতে দৃষ্ট গিরিশিখরের মত তাহার সমস্ত রুক্ষতা বিলুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যটুকুই স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে। মাধুরীও গৃহকার্য্যের অবসরে মাঝে মাঝে আসিয়া দুই বন্ধুর কথায় যোগ দিতেছিল। প্রথম পরিচয়েই অসীমকে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। এই সরল তেজস্বী যুবকের সমস্ত কথাবার্ত্তা, রঙ্গরহস্য, প্রাণখোলা হাসির মধ্য দিয়া তাহার নারীহৃদয় অনুভব করিতেছিল একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ফল্গুধারা;—অসীম খুসী হইবে মনে করিয়া মাধুরী যখনই উচ্ছ্বসিতভাবে সবিতার কথা বলিতেছিল, তখনই অসীমের মুখে একটা ম্লানছায়া সে লক্ষ্য করিতেছিল। তবে কি অসীম সবিতাকে ভালবাসে না, অথবা তাহাদের চিত্তাকাশে কোন বিরোধের মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে? এ সন্দেহ মনে হইতেই মাধুরীর মন অসীমের প্রতি আরও স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিল।

অসীম ভাবিতেছিল,—কী সুখী তাহার এই কবিবন্ধু অতুল! এমন সুন্দরী বিদুষী স্নেহময়ী পত্নী যাহার গৃহে, তাহার অভাব কি! দারিদ্র্যের দুঃখ—সে তো তুচ্ছ! এমন অফুরন্ত প্রেমোৎসবের মধ্যে দারিদ্র্যও মধুময় হইয়া উঠে। অসীম কি এমনই শান্ত মাধুর্য্যময় জীবন চায়? তাহার মন নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই কাল্পনিক চিত্রের সঙ্গে সবিতাকে না জড়াইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই মনকে

সে তীব্র কশাঘাতে সংযত করিল। এমন ক্ষুদ্র সুখ শান্তির জন্য নিজেকে কিছুতেই সে লোভাতুর হইতে দিবে না। সে চায় এর চেয়ে বৃহত্তর জীবন! ঝটিকা বিক্ষুব্ধ অশান্ত সমুদ্রবক্ষে বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে,—কিন্তু তরঙ্গশীর্ষে সাগরদোলায় যে আনন্দ, শান্ত শীর্ণ নিস্তরঙ্গ স্রোতস্বিনীবক্ষে সে আনন্দ কোথায়?…তবু ইহারা সুখী!…

কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইল। অসীম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আজ তবে আসি বৌদি, হয়ত মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত এসে পড়ে এমনই ভাবে আশ্রমপীড়া সৃষ্টি করবো,—সেজন্য প্রস্তুত থাকবেন—!

মাধুরী হাসিয়া বলিল,—আশ্রমবাসীরা আশ্রমপীড়ার ভয় করে না, বরং তাতেই তাদের আনন্দ! আর আজ থেকে আপনি কেবল এই কবিটির বন্ধু নন, আমারও বন্ধু! বন্ধুর বাড়ীতে বন্ধুর জন্য সব সময়েই আসন পাতা থাকবে—

অতুল প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—অ্যাঁ, বল কি! তুমি আমার এতকালের পুরাতন বন্ধুটাকে দখল করে নেবে! সবই তো কেড়ে নিয়েছ—শেষে—

মাধুরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—আঃ থাম! তোমার কথার কি কোন ছিরিছন্দ নেই—কেবল নামেই কবি—!

অসীমের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঈষৎ গম্ভীর ভাবেই সে কহিল,—এ সম্মান আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম! আপনার বন্ধুত্বের যেন যোগ্য হতে পারি, বৌদি—

তর্জ্জনী হেলাইয়া মাধুরী কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে বলিল,—বৌদি নয়,—বন্ধু—

হাঁ—বন্ধু—বলিয়া অসীম হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

খুব বেশী জরুরী কাজ না থাকিলে গণপতি সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতেই থাকিতেন। সেই সময় সবিতার হাতের তৈরী চা না খাইলে তাঁর মন তৃপ্ত হইত না। একটা ছোটখাট চায়ের বৈঠকও গণপতির বাড়ীতে বসিত। তাঁহার ভক্ত ও অনুগতের দল একে একে আসিয়া জুটিত এবং রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি—কোন কিছুর আলোচনাই সে বৈঠকে বাদ পড়িত না। কিন্তু আজ কয়েক দিন হইল এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে। গণপতি এ কয়দিন সন্ধ্যাবেলা বিনোদের বাড়ীতেই কাটাইতেছেন। মেয়েকে বলিয়াছেন, একটা গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া বিনোদের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা চলিতেছে, নিজের বাড়ীতে হট্টগোলের মধ্যে তাহা হওয়া অসম্ভব। সবিতা গম্ভীরভাবে পিতার কথা শুনিত, কোন উত্তর দিত না,—যদিও কি এমন গুরুতর সমস্যা, তাহা শুনিবার জন্য তাহার মনে প্রবল কৌতুহল হইত!

আজও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই, গণপতি লম্বা কোটটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সবিতা আসিয়া কহিল,—বাবা, আজ বাড়ীতেই চা-টা খেয়ে যাও না?

গণপতি কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন,—সে অনেক দেরী হবে, মা, —ওরা সব বসে থাকবে—

—দেরী হবে কেন? এই দশ মিনিটের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে আনছি!

গণপতিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সবিতা অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।

গণপতির মুখ ম্লান হইয়া গেল। সবিতার আগমন প্রতীক্ষায় তিনি অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, সবিতার ফিরিতে বহু বিলম্ব হইতেছে!

কিছুক্ষণ পরে সবিতা ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—তোমার জন্য দুখানা গরম কচুরী করে নিয়ে এলাম কিনা, এইজন্য যা একটু দেরী। তুমি বস, বাবা—

গণপতি নিরুপায় ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

চা ঢালিতে ঢালিতে সবিতা কহিল,—কয়দিন থেকেই তোমাকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌ছি, বাবা,—কি হয়েছে, আমাকে বল না—?

গণপতি কহিলেন,—সে অনেক কথা, আর একদিন বলবো—

তারপর একটু থামিয়া কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,—তুই তো জানিস্ নে, বিশ্বপতি আমার কি বিষম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—

সবিতা বিস্মিতভাবে কহিল,—শত্রুতা কিসের বাবা!—দুইজনেই তো দেশের কাজ করছো—!

গণপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—দেশের কাজের নামে দেশের সর্ব্বনাশও লোকে করে থাকে। এখন দেখ্‌ছি, বিশ্বপতি নিজের স্বার্থের জন্য সব রকম হীন কাজই করতে পারে—!

সবিতা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—বিশ্বপতি

কাকা, দেবতুল্য মানুষ। তিনি যে কোন হীন কাজ করতে পারেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই কেউ তাঁর নামে মিথ্যা করে' তোমাকে বলেছে—!

গণপতি মনে মনে খুব বিরক্ত হইলেন। তাঁর নিজের মেয়ে,—ওই ভণ্ড, বকধার্ম্মিক বিশ্বপতির সম্বন্ধে তারও এই ভ্রান্ত ধারণা! হতভাগা অসীমটাই এর জন্য দায়ী! অসীমের প্রতি তাঁহার মন আরও তিক্ত হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে কহিলেন,—তুমি এখনও ছেলে মানুষ সবিতা, সংসারের জ্ঞান তোমার কিছুই হয়নি,—কে দেবতা, আর কে দানব তা চেনবার শক্তি এখনও জন্মেনি। বিশ্বপতি বাইরে যেমন পরম সাধু সাজার চেষ্টা করে, আসলে ও তা নয়,—ওর ভণ্ডামির মুখোস এবার খুলে পড়েছে—! ও চায়—নিজের জন্য নেতৃত্ব, যশ, প্রতিষ্ঠা—

সবিতার মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সে কহিল,—তাতেই যদি উনি তৃপ্ত হন, তুমি বাধা দিও না, বাবা—

—কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বিশ্বপতির দুরাকাঙ্ক্ষায় বাধা দেব,—সাপের বিষদাঁত গোড়াতেই ভেঙ্গে ফেল্‌ব—

বলিতে বলিতে গণপতির হাত মুষ্টিবদ্ধ হইল, চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা নির্ব্বাক বিস্ময়ে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল,—পিতার এমন মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখে নাই। কিছুক্ষণ পরে কম্পিতস্বরে সবিতা বলিল,—বাবা!

গণপতি বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে থামিয়া কন্যার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

—বিশ্বপতি কাকা তোমার কত বড় বন্ধু তা তুমি ভুলে গেছ, বাবা—?

গণপতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—ভুলিনি! কিন্তু দেশের জন্য প্রয়োজন হ'লে সে বন্ধুত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে।'

সবিতার মুখ বেদনায় নীল হইয়া উঠিল, তাহার পাতলা ঠোঁট দুইটী কাঁপিতে লাগিল। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া গণপতি আরও কি বলিতে গিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পিতাপুত্রী উভয়েই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে সবিতা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল,—অসীম-দা তো আর আসে না, বাবা,—সে কি এখানেই আছে?

গণপতি শ্লেষপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—তার কাকার সঙ্গে জুটে সেও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে—

সবিতার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, একটা আর্ত্তনাদ যেন তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

গণপতি আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সবিতা নিস্পন্দ ভাবে কিছুক্ষণ সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল।

গণপতি যতই বিনোদের গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে।

ঠিক সাতটার সময় তাঁহার যাইবার কথা—সুপ্রভা নিশ্চয়ই খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছে! গণপতির মন দমিয়া গেল। তিনি সোফারকে আরও জোরে গাড়ী চালাইতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পথ আর ফুরায় না,—ক্রমাগতই যেন সে মোড় ফিরিতেছে, আর নূতন নূতন বাড়ী, তাহাদের বিশ্রী চেহারা লইয়া গণপতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অবশেষে বিনোদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া মোটর থামিল। গাড়ী হইতে নামিয়া গণপতি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই শীতকালেও রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন! তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। পরক্ষণেই তাঁহার লজ্জা হইল, ভাবিলেন,—একি? তাঁহার এত কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, ভীতি কিসের? সুপ্রভা হইলই বা শিক্ষিতা,—তবু নারী বইতো নয়! আর তিনি একজন দেশমান্য নেতা, প্রতিষ্ঠাবান উকীল। না—না, তাঁহার এই অকারণ দৌর্ব্বল্য দমন করিতে হইবে!

গণপতি দৃঢ়পদে বিনোদের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গণপতি আশা করিয়াছিলেন যে, সুপ্রভা তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিবে এবং বিলম্বের জন্য কতই না অনুযোগ করিবে! সুপ্রভার সেই অভিমানে ঈষৎ গম্ভীর, ভ্রূভঙ্গী-মনোহর মুখের সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়া গণপতি মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যখন দেখিলেন, সুপ্রভা নাই, একা বিনোদ বসিয়া কি একটা লিখিতেছে, তখন তাঁহার উৎসাহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল,—বিনোদের উপর বিষম রাগ হইল!

বিনোদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—আসুন, মিঃ রুদ্র! মোটরের শব্দ শুনে ঠিক আপনার কথাই ভাবছিলাম—

তারপর গণপতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনার কি কোন অসুখ করেছে?

গণপতি সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন,—না, না, কোন অসুখ করেনি,—আজ বড়ই কাজের চাপ পড়েছিল কিনা, তাছাড়া বিশ্বপতির এই ব্যাপারটা নিয়ে মনে সব সময়ে একটা উদ্বেগ!

গণপতির একবার প্রবল ইচ্ছা হইল, সুপ্রভা কোথায় বিনোদকে জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু কিসের একটা সঙ্কোচ তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। সুপ্রভার সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বিনোদ যদি কিছু মনে ভাবে!···কিন্তু এমন একটা স্বাভাবিক প্রশ্নে বিনোদ কেনই বা মনে কিছু করিবে?···তবু—! সুপ্রভার কি কোন অসুখ করিয়াছে?··· অথবা গণপতি আসিয়াছেন জানিয়াও সে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিতেছে না! তবে কি গণপতিরই ব্যবহারে কোন ত্রুটী বা অসৌজন্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিনোদ লোকটাও তো কম নির্ব্বোধ নয়! সুপ্রভার কথা তো নিজ হইতেই তাহার বলা উচিত ছিল—কিন্তু এমন একটা জরুরী ব্যাপারে ওর কোন খেয়ালই নাই!

এই ভাবে একটার পর একটা চিন্তার তরঙ্গ দ্রুতবেগে আসিয়া গণপতির মনের উপর আঘাত করিতে লাগিল। বাহিরে আত্মগোপন করিবার প্রবল চেষ্টায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল।

অন্যমনস্ক গণপতির দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য, একটু জোরের সঙ্গেই বিনোদ কহিল,—আমি আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে আপনার কাজ সব ঠিক করে ফেলেছি। পাঁচশো লোক আমাদের হাতে, কিছু রজত মূল্য দিলেই হবে!···সুতরাং আমাদের জয় অনিবার্য্য—বিশ্বপতিবাবুর নেপথ্যে চির বিদায়—!

বলিয়া বিনোদ জোরে হাসিয়া উঠিল।

গণপতি অবাক হইয়া বিনোদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদ উৎসাহের সঙ্গে বলিতে লাগিল,—তারপর, বিশ্বপতির কতকগুলি পরমভক্তকেও আমি হাত করেছি, তাদের জন্য কিছু বেশী দক্ষিণার ব্যবস্থা করতে হবে—!

গণপতি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—এই সব হীন উপায়ে বিশ্বপতিকে পরাস্ত করতে হবে!—গণতন্ত্রের চরম নমুনা বটে,—বিনোদ বাবু—!

বিনোদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—মিঃ রুদ্র, এটা সত্য যুগ নয়, আমরাও কিছু মহাভারতের ধর্ম্মযুদ্ধ কর্‌ছিনে। কলিযুগের রাজনীতি বড় নোংরা জিনিষ, তার নীতি—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'! আর ডেমোক্রেশীর কথা বলছেন? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডেমোক্রেশী যেখানে,—সেই আমেরিকাতে অহরহ এ সব চল্‌ছে। অথচ তাদের মত শক্তিশালী জাত দুনিয়ায় আর নেই—মানুষের মতের স্বাধীনতাও এমন কোথাও আর পাবেন না—!

গণপতি সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন,—কিন্তু—তবু—তবু—

—ওই দুর্ব্বলতাটুকু আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। এতবড় গুরুতর সমস্যা যেখানে, সেখানে মামুলী নীতির কুসংস্কারের কোন মূল্য নেই! যে জনসাধারণের উপর আপনার অসীম শ্রদ্ধা, তারা নিক্তির ওজনে এ সব বিচার করে না। তারা দেখে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, সাফল্য—বিজয়ীকেই তারা সাগ্রহে জয়মাল্য পরিয়ে দেয়। আর যে পরাজিত, তাকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে ফেলে! কার পন্থা 'সাধু'—আর কার পন্থা 'অসাধু'—এ তারা গ্রাহ্যও করে না। এই ডেমোক্রেশীর সত্যকার রূপ—!

ডেমোক্রেশীর এই সত্যকার রূপটা গণপতি বোধহয় মনে মনে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় দ্বারপার্শ্ব হইতে মধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমি আস্‌তে পারি কি—? সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দা সরাইয়া সুপ্রভা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

সুপ্রভার কণ্ঠস্বরে গণপতির চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সেই রহস্যময়ী নারী,—তার শান্ত সুন্দর মুখে, নির্ম্মল ললাটে অপরূপ সুষমা,—আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টি সরল নিসঙ্কোচ, লীলায়িত গতিভঙ্গীর মধ্যে গণপতির সমস্ত হৃদয় যেন আকর্ষণ করিতেছে।

শুভ্র সুন্দর হাত দুখানি কপালে জুড়িয়া গণপতিকে নমস্কার করিয়া সহাস্য মুখে সুপ্রভা কহিল,—কতক্ষণ এসেছেন—মিঃ রুদ্র, আমি ভাবছিলাম, আজ আর বুঝি এলেন না—!

গণপতি অপরাধীর মত বলিল,—বিশেষ একটা কাজে দেরী হয়ে গেল। কিন্তু যত কাজই থাক, আসতাম আমি

নিশ্চয়ই, আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার সাহস আমার নেই—

বলিয়া গণপতি কুণ্ঠিতভাবে হাসিতে লাগিলেন। সুপ্রভা ঈষৎ সলজ্জভাবে বলিল,—সে আমাদের উপর আপনার অনুগ্রহ।

—আপনাদের উপর অনুগ্রহ মোটেই নয়, মিসেস মিত্র,—আমারই স্বার্থ! আপনার সঙ্গে আলোচনায় মনে দ্বিগুণ উৎসাহ পাই, অনেক জটীল সমস্যায় নূতন আলোকপাত হয়। হাজার হলেও আমরা সেকেলে, আপনাদের মন এখনও তাজা, দৃষ্টিও নূতন—

বিনোদ গম্ভীরভাবে বলিল,—আলোচনায় ওঁর আগ্রহও কম নয়। এই দেখুন না, ওঁর আজ মিসেস গুপ্তের বাড়ীর পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল,—কিন্তু উনি গেলেন না, বোধ হয় আপনারই জন্য—

গণপতির অন্তরে একটা পুলক প্রবাহ বহিয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে তিনি কহিলেন,—সত্য নাকি মিসেস্ মিত্র? তবে তো আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে!

বিনোদের কথায় সুপ্রভার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িয়াছিল। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সহজ করিয়া সে বলিল,—ওঁর কথা শোনেন কেন! অমন কতদিনই যাই নে। ওসব 'ফ্যাসনেবল পার্টি আমার ভালও লাগে না—।

গণপতি সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—পার্টিতে কি হয়?

সুপ্রভা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল,—কি আর হবে! মেয়েদের হাসি, গান, গল্প, তাসখেলা—এই সব! আর—

একটু হাসিয়া কহিল,—জটলা ক'রে পরনিন্দা, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গুণগরিমা কীর্ত্তন!

বিনোদ কহিল,—অর্থাৎ দশজন পুরুষ একত্র হলে যা করে, প্রায় তাই-ই আর কি ! আমেরিকার মেয়েরা কিন্তু ওরকম নয়,—তারা দশজন একত্র হলে দেশ ও সমাজের কথা ভাবে, কাজের পরামর্শ করে।

গণপতি কহিলেন,—সবই কি আর তাই, নিত্য নূতন ফ্যাসন নিয়ে ব্যস্ত, লঘুপ্রকৃতির মেয়েরও আমেরিকায় অভাব নেই ! এইতো সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, ও-দেশের কতকগুলো মেয়ের খেয়াল হয়েছে, রাতদিন গাছে চড়ে বসে থাকবে ! মেয়েদের আত্মহত্যারও একটা সমিতি আছে নাকি —!

বিনোদ কহিল,—আমাদের দেশেও একটা আত্মহত্যার ক্লাব করলে মন্দ হয় না। কেবল মেয়েরা নয়, অনেক পুরুষও তাতে যোগ দিতে পারে—

খুব একটা রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া বিনোদ হাসিতে লাগিল।

সুপ্রভা গম্ভীরভাবে বলিল,—এদেশের মেয়েদের আত্মহত্যা করবার জন্য ক্লাবের দরকার হয় না,—কেননা দড়ি কলসী, কেরোসিন তেলের অভাব নেই ! তাছাড়া, অহরহ তারা যে তুষানলে দগ্ধ হয়, আত্মহত্যার চেয়েও তা ভয়ানক !

আলোচনার গতি যে কুটীল পথ অবলম্বন করিয়াছে, দাম্পত্য কলহে তার শেষ হইবে আশঙ্কা করিয়া, বিনোদ সহসা উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—ও মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে,—একখানা জরুরী তার করতে হবে। আপনি বসুন, মিঃ রুদ্র, আমি আসছি---

বলিয়া বিনোদ ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

গণপতিও উঠিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, সুপ্রভা কহিল,—আমার সেই নারী প্রতিষ্ঠানের কথাটা সেদিন শেষ হয় নি, মিঃ রুদ্র! জানি, আপনার কাজের অন্ত নাই, তবু ওরই মধ্যে আমাদের জন্যও একটু ভাবতে হবে—

গণপতি যেন একটা আশু সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ভাল হইয়া বসিয়া উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন,—সে কি কথা মিসেস মিত্র, আপনাদের দাবীই তো সকলের আগে! এ কয়দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কেবল আপনার প্রতিষ্ঠানের কথাই ভেবেছি। ও-দেশের নারী আন্দোলন সম্বন্ধে যে সব বই আপনাকে দিয়েছিলাম, তা পড়েছেন কি?

—পড়েছি। কিন্তু তা পড়ে আমার মনে একটা সংশয় জেগেছে। আমাদের যে বিলাতের মেয়েদেরই হুবহু নকল করতে হবে, সে কি ঠিক? আমাদের দেশেরই সভ্যতা ও সাধনার অনুরূপ কোন স্বতন্ত্র পথ বেছে নেওয়া যায় না কি? আমার বিশ্বাস, জাতির ভাবধারা আর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যার যোগ নেই, এমন কোন আন্দোলন কোন দেশে টিকতে পারে না—!

গণপতির ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইল। সুপ্রভার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—শেষে আপনিও ঐ সব পুরানো কথার কুয়াসার জালে ধরা পড়লেন, মিসেস মিত্র! নূতন যুগের বিজ্ঞানের আলোকে ও-সব কুসংস্কার অনেক দিন আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সত্য যা, তার কি পূর্ব্ব পশ্চিমে তফাৎ আছে—বিলাতের সূর্য্য কি ভারতে আর এক মূর্ত্তিতে দেখা দেয়? বিলাতের মেয়েদের সঙ্গে এদেশের মেয়েদের নারীত্বে যখন কোন প্রভেদ নাই, তখন তাদের

পথই বা বিভিন্ন হবে কেন? নারীর চলার পথে পুরুষ যুগ যুগ ধরে যে প্রবল বাধা রচনা করেছে, আবর্জ্জনা সঞ্চয় করেছে, আজ সেই গুলাকেই আপনারা যদি "সনাতন সভ্যতা ও সাধনার" বৈশিষ্ট্য বলে জাঁক করেন, তবে তার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে? পুরুষ নিজের স্বার্থের জন্য এ ভুল করতে পারে, কিন্তু নারীরাও যে তাই করে, এই আশ্চর্য্য!

সুপ্রভা ধীরে ধীরে কহিল,—পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কি কিছুই তফাৎ নেই, মিঃ রুদ্র?

গণপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন—না—! যেটুকু আছে, তার কারণ পুরুষের হৃদয়হীন স্বেচ্ছাচার, আর মেয়েদের দুর্ব্বলতা! এই ধরুন, অবরোধ প্রথা। আপনি কি বলতে চান, এদেশের মেয়েদের কয়েক শতাব্দী ধরে অবরোধে বন্দিনী করে' রাখা হয়েছে বলেই, ওইটাই হবে আমাদের সনাতন বৈশিষ্ট্য? আমাদের দুর্ব্বল ভীরু পূর্ব্বপুরুষেরা বর্ব্বর প্রতিবাসীর আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষা করতে না পেরে যদি তাকে গৃহকোণে লুকিয়ে রেখে থাকে,—তবে সেই কাপুরুষতাই কি চিরদিন অক্ষয় করে রাখতে হবে—?

সুপ্রভা একটু ভাবিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—কারণ হয়ত আরও থাক্‌তে পারে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে তাঁরা হয়ত ভাল মনে করতেন না, তাকে ভয় ও সংশয়ের চোখে দেখতেন—

গণপতি কিছুক্ষণ যেন অবাক হইয়া সুপ্রভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অবশেষে শ্লেষের সুরে বলিলেন,—তাই বলুন!

সনাতন সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের কথাটা নেহাত ফাঁকি, —আসল কথা ওই ভয় ও সংশয়! কিন্তু এ কেবল নারীদের অপমান নয়, সমগ্র পুরুষ জাতিরও ঘোর অপমান! পুরুষেরা কি সব হিংস্র বন্যজন্তু যে, সুযোগ পেলেই নারীদের রক্ত শুষে খাবে? এ যুগের পাশ্চাত্য নারীরা এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। তারা নিজেদেরও যেমন ক্ষণভঙ্গুর কাচের পুতুল মনে করে না, পুরুষদেরও তেমনি হিংস্র বর্ব্বর ভাবতে পারে না। আজ তারা সকল বিষয়ে অসঙ্কোচে পুরুষদের সহকর্ম্মিনী হবার দাবীই সমাজের কাছে উপস্থিত করেছে—!

সুপ্রভা তখনই কোন উত্তর দিল না, নীরবে ভাবিতে লাগিল। একটু পরে সে কহিল,—কিন্তু বহুযুগের সংস্কারও এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করা যায় না,—এও তো ভাববার কথা—!

গণপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—সংস্কার মানুষেরই সৃষ্টি, পুরাতন সংস্কারকে ভেঙ্গে, নূতন সংস্কার গড়ে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব নয়!

গণপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুপ্রভাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আজ তবে বিদায়! হয়ত কয়েকদিন আসতে পারবো না,—মায়াপুরে একটা গণসম্মিলনী হবে, না গেলে তারা কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু থামিয়া কি ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন,—আপনিও চলুন না, মিসেস মিত্র! আমাদের দেশের গরীব মজুরদের অবস্থাটা স্বচক্ষে একবার দেখে আসবেন। খোলা হাওয়ায়

আপনার শরীর মনেরও একটু উপকার হবে। সহরের বদ্ধ ঘরে বারমাস থাকা—

গণপতির এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সুপ্রভা চমকিত হইল। পরক্ষণেই ভাবিল, সেতো নিজেই দেশের কাজে যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র, মিঃ রুদ্র ভাল প্রস্তাবই করিয়াছেন। প্রকাশ্যে বলিল,—উনি বাড়ী এলে ওঁকে বল্‌বো,—উনি যদি সঙ্গে যান—

গণপতি সোৎসাহে বলিলেন,—বেশ—বেশ! মিঃ মিত্রকে আমিও বলবো। তিনি সঙ্গে গেলে, আপনার আর কোন আপত্তি থাকবে না তো?

সুপ্রভা সলজ্জভাবে বলিল,—না—না, তা নয়, তবে—

গণপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—বুঝেছি, সেই পুরাতন 'সংস্কার'! নারীর সহকর্ম্মিনী হবার দাবী, আপনিই তো অস্বীকার করছেন। আর আমরাও তো সব বন্য হিংস্রজন্তু নই—!

সুপ্রভা প্রতিবাদের সুরে বলিল,—ও সব আপনি কি বলছেন! আপনার কথায় আমি খুসীই হয়েছি।

গণপতি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—বেশ, তবে তাই ঠিক রইল। যাবার পথে আমি এই দিক দিয়েই যাব—

বলিয়া গণপতি সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

অতুল ও মাধুরীর বিবাহের আজ বার্ষিক তিথি। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক বাসন্তী রজনীতে তাহারা পরস্পরকে দেবতা ও অগ্নিসাক্ষী করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল,—আর সাক্ষী ছিল তাহাদের পরস্পরের হৃদয়ের অনুরাগ! পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে;—তাহাদের সেই প্রেম কি এখনও অম্লান আছে, কালের মলিন স্পর্শ, সংসারের কঠোরতা তাহার অনাবিল শুভ্রতাকে কি ম্লান করিতে পারে নাই?

অতুল সকালে উঠিয়া কোথায় বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, মাধুরী আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—লোকে জন্মতিথির উৎসব করে, আমরা কিন্তু আজ আমাদের বিবাহ তিথির উৎসব করবো! বেশ একটা নূতন কল্পনা, কি বল?

বলিয়া মাধুরী সাগ্রহে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার কবি-স্বামী এই নূতন কল্পনায় বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিবে, ইহাই সে আশা করিয়াছিল। কিন্তু অতুলের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, সে মাধুরীর প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল,—হুঁ।

মাধুরী কাছে সরিয়া আসিয়া স্বামীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল,—ভয় নেই গো,—ভয় নেই,—! আমি মস্ত একটা ‘পার্টির আয়োজন করতে বলবো না, খরচের কোন লম্বা ফর্দ্দও দেব না! উৎসব আমরা দুজনেই করবো,—কেবল বলবো সবিতাকে—

—কে ? তোমার সেই 'ফিরে পাওয়া' বিদূষী সখী—?

—কেবল বিদূষী নয়, সুন্দরীও,—কবির মানসী হবার মত !

বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী দুষ্টামির হাসি হাসিল।

অতুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—তবুও অর্থের প্রয়োজন, মাধুরী,—বাইরের অতিথির কাছে তো সম্মান রাখতে হবে !

মাধুরী ম্লান হাসিয়া বলিল,—আজকার দিনে আর অর্থের কথা ভেবে মন খারাপ করো না, লক্ষ্মীটি ! নইলে উৎসব আমার ব্যর্থ হবে—

মাধুরীর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল।

অতুল একবার পত্নীর ম্লান মুখের দিকে চাহিল, তারপর কোমল কণ্ঠে বলিল,—বেশ তাই হবে—!

অতুল চলিয়া গেলে মাধুরী তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি উৎসবের জন্য সাজাইতে বসিল। বাড়ীখানি ছোট, কিন্তু এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যে, কোথাও একটু কুটা পর্য্যন্ত নাই ! মেজে, উঠান সব তক তকে আয়নার মত। একখানি মাত্র বড় ঘর, সেই খানিই তাহাদের শয়ন ঘর, বৈঠকখানা—সব কিছু !

মাধুরী অল্প সময়ের মধ্যেই যেন যাদুমন্ত্রবলে গৃহের অনুপম শ্রী ফুটাইয়া তুলিল। অতুল তাহার বন্ধু একজন নবীন চিত্র-করের আঁকা কয়েকখানি ছবি উপহার পাইয়াছিল, মাধুরী সেই গুলিই চারিদিকের দেয়ালে বেশ করিয়া সাজাইল। বিবাহের সময় তাহার এক কাকীমা তাঁহার নিজের হাতে বোনা কারুকার্য্য-করা টেবিল ঢাকা ও একটা ফুলদানী

যৌতুক দিয়াছিলেন। মাধুরী কোন দিন তাহা ব্যবহার করে নাই; আজ নিভৃত স্থান হইতে সেই গুলি বাহির করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিল। প্রত্যূষে উঠিয়াই প্রতিবাসীদের বাগান হইতে সে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। ক্ষিপ্রহস্তে সেই ফুলে তোড়া বাঁধিয়া ফুলদানীতে রাখিল। তারপর পরিপাটী রূপে মালা গাঁথিয়া সম্মুখের দেয়ালে সাজাইয়া দিল।

মাধুরীর মনে পড়িল, কিশোর বয়সের কথা। মাধুরীর সৌন্দর্য্য ও রুচিজ্ঞানের প্রশংসা ছিল। পিত্রালয়ে কোন পর্ব্ব বা উৎসবের সময় তাহারই উপর সাজসজ্জা প্রসাধনের ভার পড়িত। মাধুরী সমবয়স্কা সখীদের নিকট তাহাদের নূতন গৃহস্থালীর গল্প শুনিত, আর মনে ভাবিত, তাহার নিজের গৃহ হইলে, কেমন মনের মত করিয়া সাজাইবে! নিজের গৃহ হইয়াছে, সেই সাধও অন্তরে আছে,—কিন্তু—···! মাধুরী একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই কহিল,—যাকগে, মানুষের সব সাধই কি পূর্ণ হয়!

অপরাহ্ণে স্নান করিয়া মাধুরী বাছিয়া বাছিয়া একখানি কমলা লেবু রঙের বেণারসী সাড়ী বাহির করিল। এইখানি দিয়া তাহার মা তাহাকে বিবাহের সময় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সাড়ীখানি মাথায় রাখিয়া পরলোকগত মাতার উদ্দেশ্যে সে প্রণাম করিল। অনেকদিন পরে আজ সে সযত্নে কবরী বাঁধিল, সীমন্তে চওড়া করিয়া সিন্দুরের রেখা দিল,—তারপর আয়নার সম্মুখে গিয়া যখন সে দাঁড়াইল, তখন নিজের রূপের

প্রসাধন দেখিয়া তাহার নিজেরই অধরে সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এই কমলালেবু রঙের সাড়ী খানিই সে ফুল শয্যার রাত্রিতে পরিয়াছিল। অতুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল,—তুমি এত সুন্দর, যে, কবির কল্পনাও তোমার কাছে পরাস্ত হয়—!

মাধুরী অতুলের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিয়াছিল—সুন্দর, না,—ছাই !

কবির কাব্যের উৎস সেদিন সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়াছিল, তাহাকেই ঘিরিয়া সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর বন্দনা গীতি রচিত হইয়াছিল। তাহাদের সেই পূর্ব্বরাগ, মিলন,—মিলনে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছেদের আশঙ্কা,—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মান, অভিমান, প্রণয় কলহ—সে সমস্ত আজ যেন কোন দূর অতীতের রূপকথার কাহিনী, অথবা সুখস্বপ্নের স্মৃতি !

পিতার একটু অমতেই মাধুরী দরিদ্র কবিকে স্বামীরূপে বরণ করিয়াছিল,—ঐশ্বর্য্যের চেয়ে প্রেমের মূল্যকেই সে বড় দেখিয়াছিল। তাহার সে প্রেম তো এখনও তেমনই আছে ! কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে সে কি তাহার পূর্ণ প্রতিদান পাইয়াছে ?

মাধুরীর অজ্ঞাতসারেই তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। তবু অতুলের দেখা নাই। মাধুরী একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই উঠিল। ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া, দূরাগত মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সে কেবল ঠাকুরকে উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে,—এমন সময় শ্রান্তক্লান্ত ভাবে অতুল গৃহমধ্যে

প্রবেশ করিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই মাধুরীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। অতুল চাদর খানা গৃহের এককোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল।

মাধুরী নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—এসেই শুয়ে পড়লে যে,—কোন অসুখ করেছে—?

অতুল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—তোমার উৎসব বুঝি আর হয় না, মাধুরী! কোথাও কিছু পেলাম না। মানুষের দুঃখ বুঝি স্বয়ং বিধাতাও দূর করতে পারেন না—

বলিয়া অতুল নিজের ললাটে কর স্পর্শ করিল।

মাধুরীর বুকে যেন একটা পাষাণভার নামিয়া আসিল, চোখের কোণে অশ্রু জমিয়া উঠিল। কিন্তু নিজের মনকে সংযত করিয়া যথা সম্ভব সহজ স্বরেই সে কহিল,—

তাতে আর কি হয়েছে, উৎসব তো আমরা করবোই,—না হয়, জাঁকজমক কিছু হবে না! তুমি ওঠ, হাত মুখ ধুয়ে নাও—

বলিয়া,—মাধুরী অতুলের ললাটে তাহার কোমল হাতখানি বুলাইতে লাগিল।

অতুল দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণের জন্য সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিল। তারপর সহসা উঠিয়া বসিয়া মাধুরীর একখানি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, মাধুরী, আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর!

মাধুরী স্বামীর দিকে চাহিয়া সস্মিত মুখে বলিল,—কিসের কষ্ট, আমি তো কোন কষ্ট পাইনি—!

—তুমি তা স্বীকার করবে না, জানি! কিন্তু ধনীর মেয়ে তুমি, এই অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে—

মাধুরী অতুলের ললাটে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—কিন্তু আমি তো তোমাকেই বিয়ে করেছি, তোমার ঐশ্বর্য্যকে নয়—

অতুল একথার কোন উত্তর দিল না, অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে দ্বিধাসঙ্কুচিত স্বরে কহিল,—তুমি কি এখনও আমাকে ঠিক তেমনই ভালবাস, মাধুরী?

মাধুরীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। হৃদয়ের কোন প্রান্তে সঞ্চিত একটা গূঢ় অভিমানের ব্যথা বিদ্যুতের মত একবার ঝিলিক দিয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে সে কহিল,—

—আর কখনও তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করো না! নিজের ভালবাসার পরীক্ষা দেওয়া যে নারীজীবনে কত বড় দুঃখ, তা বোঝবার ক্ষমতা পুরুষের নেই—

লজ্জিত অনুতপ্ত অতুল উত্তরে কিছু বলিতে যাইতেছিল,—এমন সময় মেঘলা দিনে সহসা-আবির্ভূত এক ঝলক সূর্য্য কিরণের মত সবিতা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া মাধুরী ও অতুলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল,—এই যে দুজনে মুখোমুখী হয়ে বসে! নিজেদের বিয়ের উৎসব ব'লে, নিজেরাই সবটুকু আনন্দ নিঃশেষে ভোগ করা কি ভাল? বন্ধুদের জন্যও কিছু রাখতে হয়—!

মাধুরী তাড়াতাড়ি অতুলের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া অভিমানের সুরে কহিল,—তবু যা হোক, মনে পড়ল! আমি

ভাবছিলাম,—বুঝিবা এই গরীব বন্ধুর কথা রাজকন্যা ভুলেই গেলেন—!

স্বামীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল,—ইনিই আমার সখী,—সুন্দরী বিদুষী শ্রীমতী সবিতা দেবী!

অতুল সবিতাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—সে তুমি না বল্‌তেই আমি বুঝেছি!

সবিতা কৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল,—সে কি! আমার মুখে কিছু লেখা আছে নাকি! শুনেছি, আপনি কবি,—কবির প্রতিভাদৃষ্টির সাম্‌নে কিছু লুকোবার জো নেই বুঝি—!

অতুল মাথা নত করিয়া বন্দনা করিবার ভাব দেখাইয়া বলিল,—আমার কবিত্ব আজ সার্থক হ'ল!

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া সবিতা কহিল,—বা কি চমৎকার সাজিয়েছিস্‌, মাধুরী! স্কুলে তোর আর্টিষ্ট বলে নাম ছিল, সে-গর্ব্ব তুই এখনও করতে পারিস্‌ বটে!

একটু থামিয়া বলিল,—তোর এই উৎসবের জন্য আমিও এক দুর্ল্লভ উপহার সংগ্রহ করে এনেছি—!

বলিয়া সবিতা রুমালে বাঁধা এক রাশ 'হাসনুহানা' ফুল টেবিলের উপরে রাখিল। অতুলের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—বাগান থেকে বেছে বেছে 'হাসনুহানা' ফুলই আনলুম কেন, জানেন কবি? আপনার কবিতা পড়লেই আমার হাসনু-হানার গন্ধ স্মৃতিতে আসে! কারণ জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে

পারবো না। জগতে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না—!

মাধুরী হাসিতে হাসিতে বলিল,—দেখ্‌ছি, তুই কেবল কবি নস, তার উপরে 'মিষ্টিক! আমি তো আগেই বলেছিলুম, দুইজনে মিল হবে ভাল—

স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল,—তুমি বোধ হয় জাননা, ও তোমার কবিতার মস্ত একজন ভক্ত—

—আমার চেয়ে বাবা আপনার কবিতার বেশী ভক্ত! তিনি বলেন, আপনিই এ যুগের একমাত্র জাতীয় কবি—

অতুলের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—কিন্তু বাহিরে সে ভাব দমন করিয়া শান্ত সহজ ভাবেই কহিল,—

—এত বড় প্রশংসার যোগ্য আমি নই! জীবন নদীর কুলে বসে নিজের মনে বাঁশী বাজাই; তাতে যদি কাউকে কিছু আনন্দ দিতে পেরে থাকি, সেই আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার, আমার কবিতা লেখা সার্থক—

মাধুরী হাসিতে হাসিতে বলিল,—ইস, এর মধ্যেই এত! একেবারে প্রথম দর্শনে প্রেম। আর ঘরে যে তোমার কবিতার এমন একজন অন্ধ ভক্ত রয়েছে, তার দিকে তো ফিরেও চাও না—!

অতুল অপ্রতিভ হইয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল,—সবিতা বাধা দিয়া বলিল,—ওঁর উপর অবিচার করিস্ নে ভাই! তোর সঙ্গে তো ওঁর কোন প্রভেদ নেই, মন্ত্র পড়ে' একই হয়ে গিয়েছিস্। সুতরাং তোর প্রশংসা ওঁর পক্ষে আত্ম

প্রশংসারই সমান!—আর আমরা হলুম বাইরের লোক, বহিরঙ্গ—

মাধুরী চোখ ঘুরাইয়া বলিল,—এত কথাও জানিস্ তুই! কিন্তু কেবল বসে বসে কথার হাট বসালে তো হবে না,—আরও কিছু বাস্তব জিনিষও চাই—

বলিয়া মাধুরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা হাসনুহানা ফুলের গুচ্ছগুলি একমনে ফুলদানীতে সাজাইতে লাগিল। তাহার সেই মৃদু-সঞ্চালিত চম্পককলিতুল্য আঙ্গুলগুলির দিকে চাহিয়া অতুলের মনে হইতেছিল, এত সুন্দর অঙ্গুলিদাম আর কখনও সে দেখে নাই,—এ কেবল শিল্পীর তুলিকারই যোগ্য! অতুল যে নীরবে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহা সবিতা বেশ অনুভব করিতেছিল। কি জানি কেন, এই নীরবতা সবিতার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। অতুলের দিকে সহসা ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলিল,—দেখুন তো কবি, কেমন সাজানো হয়েছে! আপনার পছন্দ হলেই আমি খুসী—

সবিতার প্রশ্নে স্বপ্নোত্থিতের মত অতুল বলিল,—যে সুন্দর, তার সব কাজই সুন্দর! আপনার হাতের স্পর্শে হাসনুহানার ফুলগুলি যেন পরীরাজ্যের স্বপ্ন হয়ে উঠেছে—!

সবিতার হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল,—কবির এই অতি স্তুতিবাদের জন্য ধন্যবাদ!

—কবিরা তো চিরকালই সুন্দরের স্তুতিগান করে আসছে—

সবিতার চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাধুরী বড় একটা থালাতে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল।

সবিতা সবিস্ময়ে কহিল,—এ যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! সারা দিন বসে বসে এই সব করেছিস্ বুঝি—!

অতুলও বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। মাধুরী এত আয়োজন করিল কখন? তাহাকে তো সে কিছুই বলে নাই!

মাধুরী সকৌতুকে মাথা দোলাইয়া বলিল,—ওরে, কেবল ইস্কুলের পাঠ পড়লেই হয় না,—যেই যা বলুক, মেয়েদের সবচেয়ে বড় বিদ্যা এই,—তাই স্বয়ং ঈশানী অন্নপূর্ণা—

সবিতা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল,—শুনেছি বটে, ওইটাই মেয়েদের স্বামী-বশীকরণের প্রধান মন্ত্র!—তোর অবস্থা দেখে তা অনেকটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে—

মাধুরী নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভঙ্গীতে ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল,—ওই মন্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক রকমের তুকতাক, অনেকদিন থেকেই তো প্রয়োগ করছি,—বশ করতে পারলুম কই? এযে পাষাণ দেবতা,—যতই ফুল জল নৈবেদ্য দাও, বর মিলবে না—!

বলিয়া মাধুরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অতুল এতক্ষণ নীরবে দুই সখীর কথা শুনিতেছিল। কি জানি কেন, মনে মনে সে একটু অস্বস্তিই বোধ করিতেছিল। এক পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া সে সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—আপনার সখীর কথা শুনেই একতরফা বিচার করবেন না, আমারও কিছু অভিযোগ আছে। আপনারা চিরদিনই পুরুষের

কাছে দুর্ব্বোধ্য। তাই বহু সাধনা করেও আপনার সখীর মনের নাগাল পেলাম না। আমার কাছে চিরদিনই উনি রহস্যময়ীই থেকে গেলেন—

সবিতা হাসিতে হাসিতে বলিল,—ঐখানেই তো কাব্যের উৎস, কবি! নারীকে যেদিন পড়াপুঁথির মত সবখানিই জেনে ফেলবেন, সেদিন আপনাদের কাব্যেরও অবসান হবে।

মাধুরী গম্ভীরভাবে বলিল,—তোমাদের ওসব হেঁয়ালী রাখ! আমি প্রস্তাব করি, শ্রীমতী সবিতা দেবী, তাঁর কিন্নরীকণ্ঠে গান গেয়ে আমাদের এই উৎসব পূর্ণ করুন—

সবিতা আতঙ্কের ভাব দেখাইয়া বলিল,—বাপরে! এই পৃথিবীতে কিন্নরীকণ্ঠের সঙ্গীত! সে অসাধ্য সাধন আমার দ্বারা হবে না—

অতুল কহিল,—আমিও মাধুরীর প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করি।

—তোর কথা ঠেলতে পারি, মাধুরী, কিন্তু কবির দাবী তো অগ্রাহ্য করতে পারি নে—

বলিয়া সবিতা হাসিতে লাগিল।

একটু পরেই এসরাজের সুরের সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে অপূর্ব্ব স্বর লহরী নিঃসৃত হইল। সে সঙ্গীত সত্যই মধুস্রাবী, অমৃতময়;—তার সুরের মূর্চ্ছনায় সেই গৃহের বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল! অতুলের মনে হইল, সেই সুরের স্রোতে সে যেন কোন স্বপ্নলোকে ভাসিয়া চলিয়াছে। মাধুরীও তন্ময় হইয়া সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে লাগিল।

তাহাদের তিনজনের কাছেই বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইল।

এমন সময় বাহির হইতে ভারী গলার ডাক শোনা গেল,—'অতুল—অতুল' এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ পদক্ষেপে অসীম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সহসা সবিতার সঙ্গীত থামিয়া গেল, হাত হইতে এসরাজের ছড়টা মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল। সম্মুখে অকস্মাৎ ভৌতিক দৃশ্য দেখিলে, আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ যেমন রক্তশূন্য হইয়া উঠে, সবিতার মুখও তেমনি রক্তশূন্য হইয়া গেল! অসীমও নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত অপলক নেত্রে সবিতার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের মনোরাজ্যে যেন একটা বিষম বিপ্লব ঘটিয়া গেল!

অতুল এসব কিছুই লক্ষ্য করে নাই। অসীমকে দেখিয়াই সে সোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল,—এই যে অসীম, এস, এস,—তুমি না এলে আমাদের উৎসবই আজ পূর্ণ হত না!

অসীম ধীরে ধীরে বলিল,—কিসের উৎসব? কই, আমিতো কিছু জানি না—

—রামের রাজ্যাভিষেক বা সীতার বিবাহের মত এমন কিছু সমারোহ ব্যাপার নয় যে, দেশ শুদ্ধ লোককে ডেকে বলা যেতে পারে। এই মাধুরীর মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপল যে, আজ আমাদের বিবাহ তিথির উৎসব করতে হবে, অর্থাৎ আমরা যে কেমন আদর্শ দম্পতী, তার একটা নমুনা জগতকে দেখাতে হবে—

লোকারণ।

অসীম ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—ও, তাই বল! তবে তো এমন অসময়ে রবাহুতের মত আমার এসে পড়াটা ভাল হয় নি—

অসীম ও সবিতার পরস্পরের সেই নীরব অভিনয় মাধুরীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। সে তাহাদের মুখের প্রত্যেক ভঙ্গী, রেখা ও বর্ণের আকস্মিক পরিবর্ত্তন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছিল। তাই অসীম ও অতুলের কথাবার্ত্তার প্রথম দিকটায় সে তেমন মন দিতে পারে নাই। কিন্তু অসীমের শেষ কথায় সে সজাগ হইয়া উঠিল। অভিমানের সুরে বলিল,—উঃ, কি কঠিন লোক আপনি! বন্ধুর কাছেও লৌকিকতার মূল্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চান, একটুও রেহাই দেবেন না—!

—হার মান্‌ছি! এত বড় সুদখোর মহাজন এখনও আমি হতে পারিনি। কিন্তু······বলিতে বলিতে অসীম সবিতার দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিয়া থামিয়া গেল।

সবিতার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে লাগিল। মাধুরীর কাণে কাণে মৃদুস্বরে সে কহিল,—আজ তবে আসি ভাই, বেশী দেরী করলে বাবা ভাববেন,—

মাধুরী মৃদু হাসিয়া বলিল,—এরই মধ্যে যাবি কি! আর তুই একটা গান কর্—

তারপর সহসা অসীমের দিকে ফিরিয়া বলিল,—অসীম বাবুর সঙ্গে তোর পরিচয় নেই বুঝি? অসীম বাবু, ইনি সবিতা দেবী, গণপতি বাবুর মেয়ে, আমার বাল্যবন্ধু। আর ইনি আমাদের স্বনামধন্য অসীম বাবু, তরুণ বয়সেই দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন—

কথাগুলি গম্ভীরভাবে বলিয়া একবার অসীমের দিকে, আর একবার সবিতার দিকে চাহিয়া মাধুরী অতিকষ্টে হাস্যসম্বরণ করিল।

অসীম ও সবিতা উভয়েরই অবস্থা কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহারা বিমূঢ়ের মত ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধুরী দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল,—সবিতাই না হয়, লাজুক মেয়ে, কথা বলতে পারে না,—কিন্তু আপনিও যে এত বড় লাজুক, অসীম বাবু,—ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পান, তা আমি জানতুম না—!

অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল। কোথাও যে একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে, এতক্ষণে তাহা সে আভাসে বুঝিতে পারিল,—কিন্তু কিছুই ঠিক ধরিতে না পারিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

মাধুরী স্বামীর কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল,—এদিকে এস ত, তোমার সঙ্গে খুব একটা দরকারী কথা আছে—বলিয়া মাধুরী লঘুপদে গৃহের বাহিরে গেল। অতুলও উৎসুক চিত্তে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

অসীম ও সবিতা পরস্পর মুখামুখী দাঁড়াইয়া,—গৃহ এত নির্জ্জন যে, পরস্পর পরস্পরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দও যেন শুনিতে পাইতেছিল। উভয়েই মুখ নত করিয়াছিল, কেহ কাহারও দিকে সাহস করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না, পাছে নিজের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

অসীম ভাবিতেছিল,—তাহার তো কোন অপরাধ নাই, সম্পূর্ণ বিনাদোষে মাধুরী তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছে। জ্যাঠামশায় তাহাকে খুনী আসামী বা হিংস্র বন্যজন্তুর মতই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আর মাধুরী নিষ্ঠুরের মত তাহাই সমর্থন করিয়াছে। আবাল্যের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এত বন্ধুত্ব—সবই একদিনে জলবুদ্বুদের মত মিলাইয়া গিয়াছে। অথচ সবিতা যদি আসল ব্যাপারটা বুঝিত, তবে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার ভুল ভাঙ্গিত। সে তো সবিতার কাছে সব কথা বলিবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু সবিতা যে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না, সৌজন্যের খাতিরেও একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছে না। সে-ই বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সবিতার সঙ্গে কথা বলিবে কিরূপে? সবিতা হয়ত ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে—!

সবিতা ভাবিতেছিল,—অসীম-দা এত নিষ্ঠুর হইল কিরূপে? তুচ্ছ দলাদলির মোহে সে তাহাদের সকল সম্বন্ধ এত সহজে ভুলিয়া গেল? অসীম-দা যে তাহাকে স্নেহ করে বলিয়া মনে হইত,—সে কি তবে সব ভুল—সব মিথ্যা? অসীম-দা যদি জানিত, সবিতা তাহার জন্য কত ব্যাকুল, তাহার মুখের একটা কথা শুনিবার জন্য কেমন উৎকণ্ঠিত, তবে তাহার কঠিন হৃদয়ও হয়ত বিগলিত হইত! কিন্তু সবিতা ভিক্ষুকের মত নিজের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবে কিরূপে? তাহার কি আত্মসম্মান জ্ঞান নাই,—নারী বলিয়াই কি সে এত তুচ্ছ, এত হীন?

মানুষ যে পরস্পরের অন্তরের গোপন চিন্তা জানিতে পারে না, একদিক দিয়া ইহা বিধাতার পরম আশীর্ব্বাদ

হইলেও, অন্যদিক দিয়া তাহার পক্ষে অভিশাপস্বরূপ! যদি মানুষ পরস্পরের হৃদয় স্বচ্ছ দর্পণের মত দেখিতে পাইত, তবে জগতে বহু দুঃখ, বহু অন্তর্দাহ, মানব জীবনের বহু শোচনীয় বিপত্তি নিবারিত হইত! কবি হয়ত বলিবেন, সে কথা সত্য,—কিন্তু এও সত্য যে, মানুষের হৃদয়ের ভাব যদি আগে হইতেই জানা যাইত, যদি গোপন করিবার কোন উপায়ই না থাকিত,—তবে জীবনের সমস্ত আনন্দ, মনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, জগতের সমস্ত প্রেম, নিঃশেষে শুকাইয়া যাইত, মানুষের জীবন ব্যর্থতার মরুভূমিতে পরিণত হইত!

জানিনা, নিক্তির ওজনে কোন দিক ভারী! কিন্তু এখানে অসীম ও সবিতা যে পরস্পরকে ভুল বুঝিল, এত কাছে আসিয়াও, পরস্পরের মনের কথা বলিবার এত সুযোগ পাইয়াও, অভিমানবশে সে শুভক্ষণ হারাইল,—তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহারা দুইজন কিছুক্ষণ একইভাবে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন কত যুগ ধরিয়া এইরূপেই তাহারা মৌন প্রতীক্ষা করিতেছে,—এ প্রতীক্ষার যেন আর শেষ নাই!

মাধুরী ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্তেই সে বুঝিতে পারিল, দুই হৃদয়ের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে তাহা দূর হয় নাই, বরং আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

• মাধুরীকে দেখিয়া সবিতার চমক ভাঙ্গিল;—সে তাড়াতাড়ি

তাহার নিকটে গিয়া বলিল,—এইবার আমি যাই ভাই,—আর দেরী করবার জো নেই—

মাধুরী মৃদু হাসিয়া চুপি চুপি কহিল,—লোকের চোখে ধূলা দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজেকে চিরকাল ফাঁকি দেওয়া যায় না, সবিতা, একদিন তার ঋণ শোধ করতেই হয়—

সবিতা কোন উত্তর দিল না, শুধু ম্লানভাবে হাসিল।

অতুল সাগ্রহে কহিল,—চলুন, আমি আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

অতুল ও সবিতা চলিয়া গেলে,মাধুরী ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—বন্ধু, মনে বড়ই আঘাত লেগেছে, নয়? কিন্তু দুঃখ বিধাতারই দান, মানুষের তা সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?

অসীম সহজভাবে হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল,—জীবনের জমাখরচের খাতায় সুখ দুঃখের হিসাব কোন দিনই রাখিনি,—ভবিষ্যতেও সে ব্যর্থ চেষ্টা করবো না—

মাধুরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—দুজনে মিলে ভিতরে ভিতরে যে এত গোল পাকিয়ে তুলেছেন, তা বুঝতে পারিনি—

অসীম সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল,—বাজে কথার চাপে, আসল কথাটাই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি, বন্ধু! এবার সহর ছেড়ে এক মজুর পাড়ায় গিয়ে আস্তানা গাড়তে হবে—।

—সে কি, মনোদুঃখে কি স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করবেন না কি—!

অসীম ম্লান হাসিয়া বলিল,—তা নয়! মুখে দেশসেবার কথা

অনেক বলেছি, এইবার হাতেকলমে কিছু কাজ করতে চাই!

—কিন্তু একেবারে মজুর পাড়ায় গিয়ে না বসলে কি দেশসেবা করা যায় না—?

—যায় হয়ত! তবে আমি এখন এই পথই বেছে নিয়েছি···

মাধুরী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কিন্তু সহরের বন্ধুদেরও ভুলে যাবেন না যেন, আমরাও মাঝে মাঝে আপনাকে দেখতে চাই—

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—মানুষের সঙ্গে দুদিনের পরিচয়ও অনেক সময় অক্ষয় হয়ে থাকে। জীবনে আর যাকেই ভুলি আপনাকে কোন দিন ভুলতে পারবো না!

* * *

অসীম ও সবিতা চলিয়া গেলে, সেই গৃহ যেন উৎসবান্তে নিরানন্দ পুরীর মতই বোধ হইতে লাগিল। অতুল ভাবিতেছিল,—বহুদিন ধরিয়া যে মানসীর সন্ধান সে করিতেছিল, আজ যেন সে তাহারই চঞ্চল চরণের নূপুর ধ্বনি শুনিয়াছে। মাধুরীর হৃদয় অসীম ও সবিতার বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। মানুষ ইচ্ছা করিয়া জীবনে এত দুঃখ টানিয়া আনে কেন? সামান্য একটু জিদ, একটু অভিমান ত্যাগ করিলেই তো অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান হইয়া যায়!—মানুষ তাহা করে না কেন?

অতুল ও মাধুরী দুইজনেই এইরূপে আপনার মনে চিন্তা করিতে লাগিল।······রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল—

শরতের আকাশে হঠাৎ মেঘ জমিয়া উঠিল, জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল।

অন্যদিনের মত একই শয্যায় তাহারা দুইজনে পাশাপাশি শয়ন করিল। কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না, এক অদৃশ্য বাধা যেন তাহাদের দুই হৃদয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া তুলিল।

আজ যে তাহাদের উৎসবরজনী শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহা ভুলিয়াই গেল!

অপরাহ্ন। বিনোদ নীচের ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি একটা লিখিতেছিল, এমন সময় দ্রুতবেগে একখানা মোটর আসিয়া বাহিরের দরজার নিকট থামিল। পরক্ষণেই গণপতি গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

—একি, বিনোদ বাবু, দিবা নিশ্চিন্তে বসে আছেন যে! পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিন, মিসেস মিত্রকে খবর দিন—

বিনোদ যেন ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া অপ্রতিভভাবে গণপতির দিকে চাহিয়া রহিল।

গণপতি মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—আশ্চর্য্য লোক যাহোক! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন,—আজ মায়াপুরে গণসম্মিলনীতে যাবার কথা যে—!

বলিতে বলিতে সুপ্রভা উপর হইতে নামিয়া আসিল। অনাড়ম্বর বেশভূষা, প্রসাধন পারিপাট্যের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই, অথচ একটা সহজ শ্রী তাহারই মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! একখানি সাধারণ মোটা সাড়ীতে সুপ্রভার গৌর তনু আবৃত, তাহার চওড়া লাল পাড়টা শিরোদেশ বেষ্টন করিয়া দেহের উপর দিয়া সুবিন্যস্ত। সীমন্তে সিন্দূরের রক্তরেখা। গণপতির মনে হইল, কোন দেবীমূর্ত্তি সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত মুগ্ধনেত্রে সুপ্রভার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, অপ্রতিভভাবে হাসিয়া সুপ্রভাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—

—এই যে আপনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। মিঃ মিত্রের চেয়ে আপনার স্মৃতিশক্তি ও সময়জ্ঞান ঢের বেশী! উনি তো কথাটা একদম ভুলেই গেছেন—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া বলিল,—কথাটা ভুলিনি। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ বিলাসগড়ের মহারাজার বাড়ী থেকে তাগিদ এসেছে, অত্যন্ত জরুরী কাজ,—না গেলেই নয়—

সুপ্রভার মুখ ম্লান হইয়া গেল,—কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

গণপতি পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন,—তা বেশত, আপনার জরুরী কাজ থাকে, আপনি এখন নাই গেলেন,—যদি পারেন, এর পরে যাবেন। মিসেস মিত্র আমার সঙ্গে চলুন—

বিনোদ কোন কথা বলিল না। একবার বিনোদের মুখের দিকে, একবার গণপতির মুখের দিকে চাহিয়া সুপ্রভা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলিল,—আমিও না গেলে চলে না কি—?

গণপতি সুপ্রভার অসমাপ্ত কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—আপনি না গেলে হতেই পারে না! আপনার যাওয়ার কথা আমি বিশেষ করে তাদের জানিয়েছি! তারা একান্ত আগ্রহের সঙ্গে আপনার প্রতীক্ষা করে আছে, না গেলে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবে—!

সুপ্রভা নিরুপায়ভাবে গণপতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—তবে চলুন,—ফিরতে দেরী হবে না তো—?

—না, না,—দেরী মোটেই নয়, মোটরে আর কতটুকু পথ, রাত্রি ৯টার মধ্যেই ফিরে আসবো।

তারপর বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মিঃ মিত্র, উদ্বেগের কোন কারণ নেই, আপনি পরের ট্রেণে যদি যেতে পারেন, চেষ্টা করে দেখবেন—

বিনোদের ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে। হইলই বা মিঃ রুদ্র তাহার বন্ধু! একজন পরপুরুষের সঙ্গে সুপ্রভার মোটরে নৈশভ্রমণ—এ ঘোর অন্যায়—অসহ্য! কিন্তু কি বলিয়া আপত্তি করিবে সে! তেমন কোন অলঙ্ঘ্য প্রবল যুক্তি সহসা সে হাতের কাছে খুজিয়া পাইল না, সুতরাং বলি বলি করিয়াও—মুখ ফুটিয়া সে কিছুই বলিতে পারিল না। বরং প্রকাশ্যে শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল,—এতে আর উদ্বেগের কথা কি—আপনি নিজে যখন সঙ্গে থাকবেন—

গণপতি গাড়ীর দিকে যাইতে বলিলেন—সে তো ঠিকই! আসুন মিসেস মিত্র,—গাড়ীতে উঠে বসুন।

মোটর ছাড়িয়া দিল। বিনোদ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বিমূঢ়ের মত একদৃষ্টে চলন্ত মোটরের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর, বিরক্তিভরে হাতের কলমটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আপন মনেই কহিল,—কি বিপদেই পড়েছি,—গেলেও হ'ত—কিন্তু বিলাসপুরের মহারাজার সঙ্গেও দেখাটা না করলেই নয়—!

নিরুপায় ভাবে বিনোদ নিজের দীর্ঘ কেশের মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল।

সুপ্রভা গণপতির নিকট হইতে দূরে গাড়ীর এক কোণে অতি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া গণপতিরও মনে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। সঙ্কোচের প্রথম

ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে, সুপ্রভাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কহিলেন,—আপনার কষ্ট হচ্ছে, এদিকে সরে ভাল হয়ে বসুন না—!

সুপ্রভা মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে শুধু কহিল—না—

গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—দেখুন, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না। আমাদের সমাজে নর নারীর মধ্যে কেমন একটা কৃত্রিম ব্যবধান গড়ে উঠেছে, যার ফলে তাদের সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ চাপা পড়ে গেছে। তারা পরস্পরকে "অস্পৃশ্য" মনে করে, এমন কি রীতিমত ভয় করে চলে! এই ভয়ের কথাটাই লোককে বুঝিয়ে দেবার জন্য, কত শাস্ত্র, কত শ্লোক রচিত হয়েছে, তার সীমা সংখ্যা নাই—

সুপ্রভা কোন উত্তর দিল না, অন্যমনস্ক ভাবে পথপার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

গণপতি একটু থামিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া পুনরায় কহিলেন,—কিন্তু এসব আদিম বর্ব্বর যুগের সংস্কার—নারী যখন ছিল গরুভেড়া ছাগলের মত পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র,—পুরুষ তাকে জোর করে লুণ্ঠন করে আনত—! এই সভ্যযুগে, সভ্য সমাজে বাস করেও আমরা যদি সেই বর্ব্বর যুগের কুসংস্কার না ভুলতে পারি, তবে তার চেয়ে কলঙ্কের কথা আর কি হতে পারে—!

সুপ্রভা এবার ধীরে ধীরে বলিল,—কিন্তু আপনি যাকে কলঙ্ক বলছেন, সেই বহুযুগের সংস্কার যে তাদের মনে গাঁথা হয়ে গেছে—

গণপতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—তা জানি,—আরও জানি, এই অস্বাভাবিক লজ্জাটাকেই আমরা এখন নারীদের সব চেয়ে.

বড় গৌরব বলে মনে করি,—তার মহিমা কাব্যে পুরাণে সহস্রমুখে কীর্ত্তন করি! কিন্তু আসলে এই 'লজ্জা' জিনিষটা কি? একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখলেই নারী লজ্জায় জড়সড় হয় কেন, এমন কি কোন পরিচিত পুরুষের কাছেও সে নির্জ্জনে একা থাকতে ভয় করে কেন? সেই পুরাতন বর্ব্বর যুগের সংস্কারের জের! পুরুষ যখন বলপূর্ব্বক নারীকে লুণ্ঠন অপহরণ করতো, সুযোগ পেলেই বন্দিনী বা ক্রীতদাসী করে' আনতো—সেই কলঙ্কময় ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন! লজ্জা জিনিষটা আসলে ভয়েরই রূপান্তর,—বংশ পরম্পরা ধরে' পুরুষ নারীর উপর যে অত্যাচার করেছে, তারই সাক্ষ্য! নারীর লজ্জা পুরুষেরই বর্ব্বরতার নিদর্শন—!

সুপ্রভা ম্লান হাসিয়া বলিল,—তাই যদি সত্য হয়, মিঃ রুদ্র, তবে এখনও তো সেই বর্ব্বর যুগের অবসান হয়নি! পুরুষকে দেখে নারীর ভয় করবার এখনও যথেষ্ট কারণ আছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুপ্রভার দিকে চাহিয়া গণপতি কহিলেন,—এই ভয়ের বিষদাঁত ভাঙ্গবার ভার এ যুগের নারীদেরই উপর—!

মোটর হাওড়া সেতুর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যাইবার আয়োজন করিতেছে, মেঘপুঞ্জের উপর সুদীর্ঘ রক্তসায়কের মত কিরণমালা পড়িয়া তাহাকে অপরূপ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। আর মৃদুতরঙ্গায়িত গঙ্গাবক্ষে সেই রক্ত মেঘের ছায়া পড়িয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সহরের তুমুল কোলাহলও যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া সূর্য্যাস্তের এই মাধুর্য্যকে উপভোগ করিতেছে।

গণপতি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন,—দেখুন—দেখুন—কি সুন্দর !

দুই জনেই নীরবে দিনান্তের সেই মনোহর শোভা, গঙ্গা-বক্ষে বিচিত্র রঙের খেলা দেখিতে লাগিল। মোটর সেতু পার হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

মায়াপুর ষ্টেশনের নিকট লোকে লোকারণ্য ! মজুরেরা তাহাদের সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছে। সেই লোকারণ্যের দিকে চাহিলে, মনে হর্ষবিষাদ যুগপৎ উদিত হয়। হর্ষ,—তাহাদের মুখে শিশুর মত সরল উল্লাস, নয়নে আগ্রহভরা দৃষ্টি দেখিয়া ;—দুঃখ হয়, তাহাদের অনাহারক্লিষ্ট অর্দ্ধ উলঙ্গ দেহ, দারিদ্র্যের পেষণে মলিনকান্তি, হতাশ নিরুপায় ভাব দেখিয়া ! এই অর্দ্ধনর অর্দ্ধপশুর দল,—ইহারাই তো সমাজের অধিকাংশ,—অথচ সমাজ ইহাদিগকেই চিরদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে ! ইহাদেরই হৃদয়ের শোণিতে, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যপুরীর মত, মানুষের সুখঐশ্বর্য্য বাড়িয়া উঠিতেছে, সভ্যতার গর্ব্বোন্নত শির আকাশ স্পর্শ করিতেছে !—কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিতেছে মুষ্টিমেয় বিলাসী অকর্ম্মণ্যের দল ; আর ইহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে,—প্রাচীন সুমেরু সভ্যতার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত—!

মোটর ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া থামিবা মাত্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল,—"জয় গণপতিজী কা জয়—জয় মাইজী কী জয় !"

গণপতি মোটরের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত জোড় করিয়া প্রসন্নমুখে বিশাল জনমণ্ডলীর সম্বর্দ্ধনার প্রত্যুত্তর

দিলেন। সুপ্রভাও গণপতির ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিতের মত তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া সলজ্জ মৃদু হাস্যের সঙ্গে সেই “রাণীর সম্মান” গ্রহণ করিল। তাহার হৃদয় উল্লাসে দুলিয়া উঠিল। এই ত জীবন—এইত কর্ম্মসমুদ্রের লহরী-লীলা—!

সেই লোকারণ্য ততক্ষণে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। তারা কোথা হইতে একখানা প্রকাণ্ড জুড়ী গাড়ী আনিয়া গণপতি ও সুপ্রভাকে তাহাতে প্রায় জোর করিয়া বসাইল এবং ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী টানিতে আরম্ভ করিল। সুপ্রভা ও গণপতি পাশাপাশি বসিয়া,—তাহাদের মনে হইতেছিল বিজয়ীবেশে তাহারা উভয়ে কোন নগরে প্রবেশ করিতেছে।

লোকারণ্যের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল—অসীম। সে নির্লিপ্ত উদাসভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছিল, আর ভাবিতেছিল—এই কি গণজাগরণ? এতকাল পর্য্যন্ত রাজা রাণী সম্রাট সাম্রাজ্ঞীদেরই মানুষ কৃতদাসরূপে পূজা করিয়া আসিয়াছে। এখন জননায়ক ও নায়িকাকে মানুষ যে সম্মান দিতেছে, সে কি সেই প্রাচীন দাসত্বেরই নবরূপান্তর নয়? যে অভিজাত্যকে মানুষ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, তাহার স্থলে কি আর এক নূতন ধরণের আভিজাত্যেরই তাহারা সৃষ্টি করিতেছে না? এই যে সহস্র সহস্র শ্রমক্লিষ্ট অর্দ্ধ উলঙ্গ ক্ষুধিত দরিদ্রের দল—ইহাদের নেতা ও নেত্রী কাহারা? জন-কয়েক মোটর বিহারী, ধনী, বিলাসী, আভিজাত্যকামীরাই

নহে কি? মানুষ একদিক দিয়া সমাজে বৈষম্য নাশ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু রক্তবীজের মত সে বৈষম্য তাহার চিত্ত ভূমি হইতে নবনব রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। হায় দুর্ভাগ্য মানুষ,—সে বুঝে না, সকল বৈষম্যের মুল তাহার নিজের মনে! সেখানে তাহার 'জড়' মারিতে না পারিলে, নিত্য নূতন বেশে বহুরূপীর মত সে দেখা দিবেই!

ভাবিতে ভাবিতে অসীম সেই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল!

মায়াপুরের শ্রমিকপল্লীর একটা সরু গলির মধ্যে অসীম বহুকষ্টে "অন্নপূর্ণা আশ্রমটাকে" আবিষ্কার করিল। ৫।৭ খানি খোলার ঘর, চারিদিকে মাটীর দেওয়াল দিয়া ঘেরা। সম্মুখে সদর দরজার উপরে বড় বড় অক্ষরে 'অন্নপূর্ণা আশ্রমের' সাইনবোর্ড।

সদর দরজা খোলাই ছিল। অসীম কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিল। কিন্তু কাহারও কোন সাড়া পাইল না। অবশেষে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনা আহ্বানেই সে ভিতরে প্রবেশ করিল। অসীম বাহিরের আঙ্গিনা পার হইয়া সম্মুখের ঘরের নিকট আসিয়াছে, এমন সময় ভিতর হইতে করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল এবং একটা বালিকা কাতর কণ্ঠে "আর মেরো না, আর মেরো না"—বলিতে বলিতে ভীত ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাতে আসিল এক গাছা বেত হাতে জনৈক বৃদ্ধ।

বালিকা অসীমকে সম্মুখে দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে কহিল,—আমাকে বাঁচান—বাঁচান,—এরা আমাকে মেরে ফেলবে—

বেত্রধারী অসীমকে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের বেতখানা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি, কি চাও? পরক্ষণেই ভীত ত্রস্ত বালিকার দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া বলিল,—যাও মা, ভিতরে যাও, তোমার সব কথা আমি পরে শুন্‌বো—

বালিকা বিস্মিত হতবুদ্ধির মত বৃদ্ধের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল, তারপর অসীমের প্রতি একবার কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে দ্বারপথে ভিতরের দিকে অন্তর্হিত হইল।

এতক্ষণে অসীম বৃদ্ধকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাইল। তাহার মাথার দীর্ঘ কেশ হইতে দীর্ঘ শ্মশ্রু পর্য্যন্ত সমস্তই শুভ্র। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা, মস্তকের পশ্চাৎভাগে লম্বিত দীর্ঘ শিখা, তাহার অগ্রভাগে একটী জবাফুল বাঁধা। পরিধানে তসরের ধূতি, পায়ে খড়ম। দেখিলে মনে হয়, বৃদ্ধ পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু, সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্রবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে নিজেকে সযত্নে সুরক্ষিত করিয়াছেন। অসীমের মনে বৃদ্ধের প্রতি একটু শ্রদ্ধার ভাব জাগিল, কিন্তু পূর্ব্ব দৃশ্যের কথা স্মরণ হইতেই, তাহার মনটা ভিতরে ভিতরে আবার তিক্ত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল,—এই সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস দত্ত মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই—

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অসীমের আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—

—আমিই ধর্ম্মদাস দত্ত, কি চাই বলুন—

—ও আপনিই—বলিয়া অসীম বৃদ্ধকে একটা নমস্কার করিল। একটু থামিয়া বলিল,—বিশ্বপতি বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে—

সহসা বৃদ্ধের মুখভাব ও কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তন।

হইল। তাহার শ্মশ্রুকণ্টকিত মুখে হাসির রেখা দেখা দিল,—গদ গদ কণ্ঠে সে কহিল,—

—ও—তুমি আমাদের অসীম, এস বাবা এস, বিশ্বপতি বাবুর পত্র পেয়ে আমি তোমারই পথ চেয়ে বসে আছি। তা বাবা, কোন গাড়ীতে আসবে খবরটা দিতে হয়, ষ্টেশনে যেতাম,—আজকালকার ছেলে তোমরা, তোমাদের ঐ তো দোষ—!

ধর্ম্মদাসের এই স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ মৃদু তিরস্কারে অসীমের মনের বিরূপ ভাব কতকটা হ্রাস হইল, কহিল,—ষ্টেশন থেকে কতটুকুই বা পথ, এর জন্য আর আপনাদের অনর্থক কষ্ট দিতে যাই কেন—

ধর্ম্মদাস একটা উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া বলিল,—শোন একবার বাবাজীর কথা! আমাদের কি আর নিজের দুঃখকষ্ট কিছু ভাববার সময় আছে! মানুষের সেবার জন্যই যে দেহমন সব উৎসর্গ করেছি,—শ্রীগুরু শ্রীগুরু—! তা বাবা, স্নান করে' দুটী খেয়ে নাও, পরে সব কথা হবে—

ভিতরের দিকে চাহিয়া উচ্চ কণ্ঠে বৃদ্ধ ডাকিল,—শান্তি—শান্তি—

পূর্ব্বদৃষ্ট সেই বালিকাটি সসঙ্কোচে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। ধর্ম্মদাস তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—অসীমের স্নানের ব্যবস্থা করত, মা, বড় পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছে—! চল বাবা, ভিতরে গিয়ে বসবে চল!

শান্তি তাহার বড় বড় চোখ দুইটা মেলিয়া আর একবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিয়া ভিতরের দিকে অদৃশ্য হইল।

স্নানের পর, খাইতে বসিয়া অসীম দেখিল, আয়োজন নিতান্ত সামান্য নয়। গরীব আশ্রমের পক্ষে রাজভোগ বলিলেও চলে! তাহার মন একটু কুণ্ঠিত হইল। তারপর বৃদ্ধ ধর্ম্মদাস যখন তাহার নিকটে বসিয়া—'এটা খাও, ওটা খাও'—বলিয়া সস্নেহ অনুযোগ করিতে লাগিল,—তখন অসীম রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িল।

ধর্ম্মদাস কহিল,—খাওয়ার বড়ই কষ্ট হল, বাবা। তোমরা বড় লোকের ছেলে, সুখে থাকাই অভ্যাস,—তোমাদের কি এসব সহ্য হয়!

অসীম লজ্জিতভাবে কহিল,—কই কিছুই তো কষ্ট হয় নি,—বরং আমার জন্য প্রচুর আয়োজনই আপনি করেছেন—

—তা বাবা, আশ্রমবাসীদের কোন দিন দুমুঠা জোটে, কোন দিন জোটে না। হয়ত বা কোন দিন শুধু একটু কড়াইয়ের ডাল দিয়েই আহার শেষ করতে হয়—

বলিয়া ধর্ম্মদাস অমায়িকভাবে হাসিতে লাগিল।

অসীম একটু ইতস্ততঃ করিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—আমি বড় লোকের ছেলে মোটেই নই, দত্ত মশায়! আশ্রমে যখন থাকতে হবে, তখন আশ্রমবাসী আর সকলের মতই আমার ব্যবস্থা করবেন, তার বেশী একটুও নয়—

ধর্ম্মদাস বিস্মিতভাবে কহিলেন,—সেকি কথা, বাবা, তুমি থাক্‌বে আশ্রমে,—কিসের দুঃখে, পারবেই বা কেন?

অসীম ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—দুঃখ নয় বলুন,—আনন্দ! আপনি এই সব গরীব ছেলেমেয়েদের সেবা করে,—তাদের বোঝা

নিয়ে যে আনন্দ সঞ্চয় করছেন, তারই কিছু অংশ ভাগ করে নেব—

ধর্ম্মদাস গম্ভীর হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন,—আমাদের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, জীবনের দেনাপাওনা সব শোধ করে দিয়ে এসেছি,—সুতরাং এই পরের দুঃখের বোঝা বহন করা আমাদের সাজে। কিন্তু তোমরা যুবক, ভবিষ্যতের আশা আনন্দ সবই তোমাদের সম্মুখে। তোমাদের স্বেচ্ছায় এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করবার দরকার কি, বাবা ?—সব কাজ সকলের জন্য নয়—

—কিন্তু আপনাদের মত প্রাচীনেরাই কেবল এই সব গুরুভার বহন করবেন, আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখব, এওতো ঘোর অন্যায়! বরং যুবকদেরই এ ত্যাগ ও দুঃখের ব্রত গ্রহণ করবার দায়িত্ব বেশী, কেননা তাদের মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্য্য আছে! যে জাতির নবীনেরা মহৎ আদর্শের জন্য, দেশ ও সমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত নয়, বৃদ্ধদের উপরেই সে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, সে জাতির প্রাণশক্তি হ্রাস হয়ে এসেছে, বুঝতে হবে, দত্ত মশায়—

অসীমের কথাগুলি ধর্ম্মদাস বোধ হয় ভাল বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বিমর্ষভাবে সে কহিল,—

—বেশ তো বাবা, তুমিই এ আশ্রমের ভার নাও, আমাকে ছুটী দাও, আমি তো তীর্থের পথে পা বাড়িয়ে বসে আছি—

একটু থামিয়া পুনরায় কহিল,—তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা, লোটা কম্বল নিয়ে হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম আর কি!

বিশ্বপতি বাবু বললেন,—'দত্ত মশায়' আপনার যাওয়া এখন হবে না, এই সেবাশ্রমের ভার নিতে হবে।' বিশ্বপতির বাবুর কথা ঠেলতে পারি না, কর্ম্মের বন্ধনও তখন কাটে নাই, কাজেই রয়ে গেলাম। তারপর এই তিন বৎসর ভিক্ষামাত্র সম্বল করে কি ভাবে আশ্রম চালিয়েছি, তা একমাত্র শ্রীগুরুই জানেন,—

বলিয়া ধর্ম্মদাস উদ্দেশে শ্রীগুরুকেই, বোধ করি, প্রণাম করিল।

অসীম আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল,—সে কি কথা, দত্ত মশায়, আপনি না থাকলে কি আর আশ্রম চলে! আমি তো আপনার আজ্ঞাবহ সেবক মাত্র—যা বলবেন, তাই করবো।

ধর্ম্মদাসের মুখ ঈষৎ প্রসন্ন হইল, দীর্ঘ শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে সে বলিল,—তোমারই যোগ্য কথা বাবা! কিন্তু মায়ার বাঁধন তো একদিন কাটতেই হবে, সুতরাং এখন থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল—

অসীম হাসিয়া বলিল,—সে দিনের অনেক দেরী! এখন একটা কথা শুনুন,—শীগ্‌গীরই আশ্রমে একটা পাঠশালা খুলতে চাই, পল্লীর গরীব ছেলেমেয়েরা সেখানে এসে পড়বে।

ধর্ম্মদাস অপ্রসন্ন মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল,—ওই জায়গাতেই তোমাদের সঙ্গে আমার মতভেদ, বাবাজী। গরীবদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে চাও, কর,—কিন্তু লেখা-পড়া শেখালে, তারা যে ভদ্রলোকদের মাথায় চড়ে বসবে!

অসীম বিস্মিতভাবে কহিল,—আপনি কি চিরকালই ওদের পায়ের তলায় রাখতে চান—?

—ওরা লেখাপড়া শিখলে সমাজে ঘোর অশান্তি হবে, এও একটা ভাববার কথা, বাবাজী—

অসীম মৃদু হাসিয়া বলিল,—আগ্নেয়গিরির মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখলেই কি ভিতরের অগ্নিস্রোতের গতিরোধ করা যায়, দত্ত মশায়? একদিন সে সমস্ত বাধা ঠেলে ধ্বংসের মূর্ত্তিতে দেখা দিবেই! তার চেয়ে আগে থেকেই পথ প্রস্তুত করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

ধর্ম্মদাস লম্বা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—যা ভাল বোঝ কর, বাবাজী,—আমি ওর মধ্যে নেই! শ্রীগুরু—শ্রীগুরু—

রাত্রিতে একটা ঘরে সামান্য একখানা খাটীয়ার উপরে কম্বল পাতিয়া অসীম শয়ন করিয়াছিল। উপরে খোলা ছাদ, নীচে মাটীর মেজে, চারিদিকে মাটীর দেয়াল, ঘরে জানালা দরজা নাই বলিলেই হয়। এরূপ ঘরে এরূপ শয্যায় অসীম, বোধ করি, জীবনে এই প্রথম শয়ন করিল। অসীমের মন প্রথমটা একটু দমিয়া গেল, পরক্ষণেই ভাবিল, সে যে-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, এই তো সবে তাহার আরম্ভ!

দেশের এক প্রান্তে এই নিভৃত শ্রমিকপল্লীতে অজ্ঞাতবাস—জন কয়েক দরিদ্র অসহায় ছেলেমেয়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ—! বৃদ্ধ ধর্ম্মদাস একহিসাবে ঠিকই বলিয়াছেন,—তাহার যৌবনের অনন্ত আশা, দেশ-সেবার অদম্য উৎসাহ—এ সব কি এই সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রেই সমাধি লাভ করিবে, সমুদ্রের পিপাসা কি গোষ্পদেই শান্ত হইবে?···কিন্তু এই অনশনক্লিষ্ট, নিরাশ্রয়,

সর্ব্বহারা, হতভাগ্যের দল,—এরাও তো মানুষ! এদের দুঃখ কষ্টের জন্য দেশ ও সমাজই কি দায়ী নহে? অথচ দেশ ও সমাজ সে দায়িত্ব এড়াইতে ইহাদিগকে উপেক্ষাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। অসীম সমাজের সেই বিপুল ঋণের এককণাও যদি শোধ করিতে পারে! কে জানে, এই সব হতভাগ্যদেরই মধ্যে কি বিরাট শক্তি সুপ্ত আছে,—একদিন হয়ত তাহাদের মধ্যে কেহ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে! আর দেশ-সেবা! এরাও তো নারায়ণ—এদের মধ্য দিয়া সেই নারায়ণকেই যদি সে সেবা করে, তবে দেশ-জননীর চরণ-প্রান্তেও কি তাহার পূজার ফুল পৌছাইবে না?

অসীমের মনের অবসাদ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল;—এমন কি, অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা আনন্দ মিশ্রিত গর্ব্বও সে অনুভব করিল। গণপতির রূঢ়তায়, সবিতার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে, তাহার হৃদয়ে যে অসহ্য জ্বালার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিছুক্ষণের জন্য তাহা সে বিস্মৃত হইল। জীবনের সহস্র দুঃখ ও আঘাতের বেদনা হইতে মানুষ এমন করিয়াই বুঝি সান্ত্বনা-লাভের চেষ্টা করে! ইহাকে আত্ম-প্রতারণা বলিতে চাও, বল, কিন্তু ইহাই অনেক সময় হতভাগ্য মানুষের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র!

সহসা কাহার লঘু পদশব্দে অসীমের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল; ফিরিয়া দেখিল, শান্তি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়াছে; অসীম তাহার দিকে চাহিতেই সে মুখ নত করিল।

অসীম স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—কি শান্তি, কিছু বলবে?

অসীমের কণ্ঠস্বরে শান্তির বোধ হয় সাহস হইল। কি যেন বলিবার চেষ্টাও সে করিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল তাহার পাতলা ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল।

শান্তির বয়স ১২।১৩ বৎসরের বেশী নয়। তাহার পাতলা ছিপছিপে গড়ন, তাহার উপর, বোধহয়, দুঃখকষ্ট অনাহারে সে আরও ক্ষীণাঙ্গী হইয়াছে। গায়ের রং এককালে শ্যামবর্ণ ছিল, এখন মলিন হইলেও তাহার স্নিগ্ধতাটুকু সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই এই দরিদ্র বালিকার মুখখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট, টিকল নাসিকা—দেখিলে মনে হয় না যে, এ কোন দরিদ্র শ্রমিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বোপরি, তাহার মুখশ্রীর মধ্যে এমন একটা মধুর নম্রতার ভাব আছে, যাহা সহজেই লোকের হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার করে।

অসীম শান্তির সঙ্কোচ ও ভীরুতা বুঝিতে পারিয়া কহিল,—ভয় কি শান্তি, এদিকে এস।

শান্তি ভয়ে ভয়ে দ্বিধাজড়িত পদে আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু এবারও কোন কথা বলিতে পারিল না।

অসীম কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া বলিল,—দত্ত মশায় পাঠিয়েছেন, আমাকে কিছু বল্‌তে?

শান্তি তাহার আসিবার উদ্দেশ্য ভুলিয়াই গিয়াছিল। দত্ত মশায়ের নাম শুনিয়াই সহসা সুপ্তোত্থিতের মত বলিয়া উঠিল,—কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার জন্য বালিশ বিছানা কিছু পাঠাতে হবে কিনা—

অসীম হাসিয়া কহিল,—এই কথা! তাঁকে বলবে, বেশ আরামে আছি, কোন কিছুর প্রয়োজন নাই আমার—!

খাটিয়ার উপরে পাতা অসীমের কম্বল শয্যার দিকে শান্তি একবার বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শান্তি ফিরিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতে,—অসীম ডাকিল,—শোন—শান্তি—

শান্তি থমকিয়া দাঁড়াইয়া অসীমের দিকে সভয়ে চাহিল।

—তুমি কতদিন হল এ আশ্রমে আছ?

শান্তি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল—৬ বছর—!

—তোমার বাপ মা, কোন আত্মীয় স্বজন কেউই কি নাই—?

শান্তি কাতর দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে ফোটা ফোটা অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডস্থল সিক্ত করিল।

অসীম ব্যস্তভাবে কহিল,—কেঁদোনা—কেঁদোনা—তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সব বুঝেছি—

শান্তি নির্ব্বাক বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত অসীমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই অল্প কয়েক বৎসরের জীবনে যে কয়জন মানুষের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছে, তাহারা তো কেহই এমন নয়! এমন দয়া, এমন স্নেহ, এমন কোমলতামাখা কণ্ঠস্বর সে তো আর দেখে নাই! তাহার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে,

ভদ্রলোকেরা সকলেই ধম্মদাস দত্তের মত,—অমনই নির্ম্মম, হৃদয়হীন, কঠোর! অসীমকে দেখিয়া তাহার সেই বদ্ধমূল ধারণার উপরে আঘাত লাগিল, মনে হইল, ইনি ভদ্রলোক হইলেও ইঁহার হৃদয়ে তাহার মত দারিদ্রের জন্য স্নেহের অভাব নাই, অসঙ্কোচে নিজের ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখকষ্টের কথা তাঁহার নিকটে বলিতে পারা যায়। সে সব দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ঘৃণায় ইনি নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না।

তাহার জীবনের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত,—দুই চারিটি কথাতেই সে অসীমকে তাহা জানাইয়া দিল। বাপ ছিল জাতিতে মাহিষ্য, মেদিনীপুরের কোন এক গ্রামের চাষী প্রজা। বহু পুরুষ ধরিয়া মাটির সঙ্গেই তাহারা সমগ্র দেহমন দিয়া আত্মীয়তা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সেই বহু শতাব্দীর আত্মীয়তার বন্ধন—এক আঘাতে ছিন্ন করিয়া দিল গ্রামের লোভী জমিদার, বাঁকী খাজনার অজুহাতে সমগ্র জমিটুকু নীলামে চড়াইয়া। শান্তির বাপ মা তাহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া আসিল মায়াপুরের কলে মজুরী করিবার জন্য। তারপর পাঁচ বৎসর ধরিয়া কলের শোষণে তাহাদের রসরক্ত সমস্তই শুষ্ক হইয়া গেল,—দারিদ্র্যে অর্দ্ধাশনে আলোবাতাসহীন বস্তীর মধ্যে ধুঁকিতে ধুঁকিতে একদিন তাহারা জীবনের খেলা শেষ করিল। বালিকা শান্তিকে একজন লোক দয়া করিয়া এই আশ্রমে ফেলিয়া দিয়া গেল। সেই হইতে সে আশ্রমেই আছে!

অসীম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—এখানে কি তোমার খুব কষ্ট হয়, শান্তি?

শান্তি একথার কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহার দুই গণ্ড বহিয়া ফোটা ফোটা অশ্রু পড়িতে লাগিল।

এই তো জীবন—অতি সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর, করুণ, মর্ম্মস্পর্শী! অসীমের মনে হইল, অধিকাংশ শ্রমিকের জীবনের মূলেই এমনই শোচনীয় কোন ইতিহাস আছে। অসীমের হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হইল, দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে শান্তির দিকে চাহিয়া গাঢ় স্বরে বলিল,—

—যাও শান্তি, শুতে যাও—

শান্তি অসীমের দিকে লজ্জিত অপরাধীর মত কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অসীম মজুর পাড়ার ভিতরকার অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য একাকীই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত! মানুষ যে বন্যজন্তুর মত এইভাবে বাস করিতে পারে, স্বচক্ষে না দেখিলে সে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না! গর্ত্তের মত এক একখানি ঘর, আলো বাতাস প্রবেশের পথ নাই;—তাহাতে একজন মানুষেরও ভাল করিয়া পা ছড়াইয়া বসিবার জায়গা হয় না,—অথচ তাহারই মধ্যে একপাল ছেলেমেয়ে লইয়া বেচারারা কোনমতে মাথা গুঁজিয়া থাকে! ছেলেমেয়েরা ধূলাকাদা মাখিয়া উলঙ্গ দেহে নোংরা গলির আবর্জ্জনার মধ্যে খেলা করিতেছে, তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় বাপ মা কাহারও নাই,—কেননা উভয়েই কলের মজুর, উদয়াস্ত খাটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহারা যে মজুরী পায়, তাহাতে দুই বেলা তাহাদের দুমুঠা অন্নই জুটে না,—ছেলেমেয়েরা এক ফোটা দুধও পায় না,—জামা কাপড় তো দূরের কথা! বস্তুতঃ, ইহাদের সংসার বলিয়া গৃহ বলিয়া কিছু নাই,—কোনরূপে 'বেদের টোলের' মত একটা আস্তানা ফেলিয়া থাকে মাত্র! এই সব দিগম্বর, অর্দ্ধনর, অর্দ্ধপশুবৎ বালক বালিকারা খেলিতে খেলিতে পরস্পরের প্রতি এমন সব অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, যাহা শুনিয়া অসীমের কাণে আঙুল দিতে ইচ্ছা হইল। ইহাদিগকেই শিক্ষাদানের ভার

তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই কথা ভাবিয়া তাহার মন একটু দমিয়া গেল!

অসীমকে দেখিয়া ছেলেমেয়েরা সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ কেহ বা একটু দূরে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে অসীমের দিকে চাহিয়া চুপি চুপি কি সব বলিতে লাগিল। অসীম ভাবিল, জামাকাপড়-পরা ভদ্রলোককে—পল্লীর মধ্যে তাহারা দেখিতে অভ্যস্ত নয়, সুতরাং সে ইহাদের চোখে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের লোক! অসীমের চিত্ত ব্যথিত হইল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অসীম দেখিল, একটা গলির মোড়ে বিস্তর লোক জমা হইয়াছে। সে কৌতূহলী হইয়া ভীড়ের একপাশে গিয়া দাঁড়াইল। একজন কাবুলী প্রকাণ্ড পাগড়ী মাথায় এবং ততোধিক প্রকাণ্ড লাঠী কাঁধে একটা কুঁড়ে ঘরের নিকটে দাঁড়াইয়া, অশ্রাব্য ভাষায় অজস্র গালিগালাজ করিতেছে। সেই কুৎসিত গালি শুনিলে মরা মানুষও বোধহয় চঞ্চল হইয়া উঠে! আর একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান একখানা পিতলে বাঁধানো মোটা লাঠী হাতে সেই কুঁড়ে ঘরের দরজার সম্মুখে ভ্রূকুটী কুটীল নয়নে বসিয়া আছে। কুঁড়ে ঘরের মধ্যে এক শীর্ণকায়া বেহারী রমনী, অতি রুগ্ন একটা শিশু কোলে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে!

তর্জ্জন গর্জ্জন, চীৎকার, গোলমাল ও ক্রন্দনের মধ্য হইতে অসীম বহু কষ্টে ঘটনার এইটুকু মর্ম্মোদ্ধার করিল যে, মেয়েটীর স্বামী কলের মজুর। গত বৎসর শীতকালে সে এই কাবুলীর নিকট হইতে ধারে একখানা গায়ের কাপড় কিনিয়াছিল,—

এবারে 'সুদে আসলে' তাহার জন্য পাওনা হইয়াছে প্রায় কুড়ি টাকা! আর কলের দারোয়ানের কাছে মজুরটা ধার করিয়াছিল, দশ টাকা, তাহাও সুদে আসলে প্রায় কুড়ি টাকা দাঁড়াইয়াছে। আজ উভয়েরই টাকা শোধ দিবে বলিয়া সে কথা দিয়াছিল, কিন্তু ভোর রাত্রি হইতেই কোথায় সে পলাতক। বেচারী মেয়েটা স্বামীর খবর কিছুই জানে না,—তাহার হাতে একটা পয়সা নাই;—মহাজনকে টাকা দেওয়া দূরের কথা, আজ আর তাহার অন্ন জুটিবারও সম্ভাবনা নাই,—এমন কি কোলের ছেলেটাকে একটু দুধ পর্যন্ত কিনিয়া দিতে পারিবে না!

কাবুলী তাহার আধা হিন্দী, আধা পস্তু মিশ্রিত অপভাষায় কহিল,—যতক্ষণ টাকা না পায়, ততক্ষণ সে দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া থাকিবে, একপাও নড়িবে না!

হিন্দুস্থানী দারোয়ান বলিল,—তাহার টাকা না পাইলে, স্বামী স্ত্রী কাহাকেও সে কলের কাজে যাইতে দিবে না, পথ আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে—!

মেয়েটা চীৎকার শব্দে কান্না জুড়িয়া দিল,—বাহিরে যে সব লোক জমিয়াছিল, তাহারাও সোরগোল আরম্ভ করিল।

দুই তিনজন প্রবীণ লোক অগ্রণী হইয়া বলিল যে, কাবুলী ও দারোয়ান উভয়েই সেদিনের মত ফিরিয়া যাক, যাহাতে টাকা আদায় হয়, তাহারা সে চেষ্টা করিবে। কিন্তু কাবুলী বা দারোয়ান তাহাদের এই প্রতিশ্রুতি গ্রাহ্য করিল না।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে কাবুলী অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল, যে, সে ঘরে ঢুকিয়া থালা ঘটী বাটী, কাপড় চোপড় যাহা কিছু আছে, টানিয়া লইয়া যাইবে। হিন্দুস্থানী দারোয়ানও মাথা নাড়িয়া এই মধুর প্রস্তাবে সায় দিল।

জনতার মধ্য হইতে কয়েকজন অগ্রসর হইয়া তখন আইনের আপত্তি তুলিল,—কহিল, আদালতের ডিক্রী ছাড়া মহাজনের এরূপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, এমন বে-আইনী কাজ তাহারা কিছুতেই হইতে দিবে না।

কাবুলী তাহার দীর্ঘ লাঠীখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল,— উহাই তাহার কাছে একমাত্র আইন, আর কোন আইন সে মানে না!—বলিয়া সে জোর করিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল।

চীৎকার, গোলমাল ও ক্রন্দনের শব্দ চরমে উঠিল। কিন্তু কেহই কাবুলীকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল না।

অসীম একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। এবার আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কাবুলী ও দারোয়ান উভয়ের সম্মুখে গিয়া বলিল,—এ মগের মুলুক নয়, তাহারা কিছুতেই এমন জোর জবরদস্তী করিতে পারিবে না। দেনদার যখন বাড়ীতে নাই, তখন তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কাবুলী অসীমকে দেখিয়া প্রথমে একটু থতমত খাইল, কিন্তু পরক্ষণেই—"বাঙ্গালী বাবুর" উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী দারোয়ানও তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া 'ভেতো

বাঙ্গালী বাবুর' প্রতি নানারূপ মধুর বাক্য প্রয়োগ করিল। অসীম তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া—কুঁড়ে ঘরের দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্রুদ্ধ কাবুলী ও হিন্দুস্থানী দরোয়ান উভয়েই তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু এই সময়ে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। এতক্ষণ যে সমস্ত লোক উদাসীন দর্শকরূপে দাঁড়াইয়াছিল, কাবুলী বা দারোয়ানের কার্য্যে বাধা দিতে সাহস পাইতেছিল না; অসীমের আচরণে এক মুহূর্ত্তে তাহাদের ভীরুতা দূর হইল। তাহারা যেন এতক্ষণ কেবল একজন নেতার অভাব অনুভব করিতেছিল,—অসীমকেই সেই নেতার আসনে বসাইয়া তাহারা যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বিশপঁচিশ জন ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল,—তাহারা কিছুতেই এ অত্যাচার সহ্য করিবে না,—কাবুলী বা দরোয়ান যদি ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করে, অথবা মেয়েটার গায়ে হাত দেয়, তবে তাহারা একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করিবে! তাহাদের চীৎকার ও গর্জ্জনে, আরও বহুলোক, লাঠিসোঠা যে যাহা হাতের কাছে পাইল, তাহাই লইয়া ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সেই সঙ্কীর্ণ গলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। ভীড়ের মধ্যে বাঙ্গালী, বেহারী, উড়িয়া, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, কচ্ছী সব রকমের লোকই ছিল। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির এই সব লোক একত্র হইয়া 'বস্তীসমাজ' গড়িয়া তুলিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একবিন্দুও প্রাণের যোগ নাই,—কিন্তু কোন একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার গন্ধ

পাইলেই, ইহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের মনের মিল দেখা যায়!

ব্যাপার দেখিয়া চতুর হিন্দুস্থানী দারোয়ান আগেই সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বিপুলকায় যষ্টিধারী কাবুলী অত সহজে পলাইতে পারিল না। সকলে তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

অসীম প্রমাদ গণিল। গণমনের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল না। সুতরাং ঘটনার এই আকস্মিক পরিণতি দেখিয়া সে বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। দুইহাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সকলকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে সে কহিল,—ভাই সব, এই কাবুলীকে আজ ছেড়ে দাও,—একজন লোকের উপর সকলে মিলে অত্যাচার করা মরদের কাজ নয়।

জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল,—কয়েকজন একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল,—ওকে আমরা আজ কিছুতেই ছাড়বো না, গলা টিপে মেরে ফেলবো! আমাদের উপর ও আরও অনেকবার এমনি অত্যাচার করেছে—

অসীম নিরুপায় হইয়া কাবুলীকে আড়াল করিয়া জনতার সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—হয় ওকে ছেড়ে দাও, অথবা আমাকে আগে মার—

জনতা কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইল, কেবল একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি চারিদিক হইতে শোনা যাইতে লাগিল।

সহসা ভীড়ের ভিতর হইতে একজন বাঙ্গালী মিস্ত্রী অগ্রসর

হইয়া বলিল,—ছেড়ে দিতে পারি,—যদি ও এখনি নাকে খত দেয়—

সকলে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—হাঁ, হাঁ—যদি ও নাকে খত দেয়—

কিন্তু কাবুলী কিছুতেই এই অপমানকর সর্ত্তে স্বীকৃত হইল না।

অসীম জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—ভাই সব, আজ ওর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, নাকে খত দেওয়ার চেয়েও বেশী! আর কখনো এমন কাজ করবে না,—তোমরা ওকে ছেড়ে দাও—

জনতা আবার কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইল, যেন দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। তারপর অনেকে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

এবার স্থূলবুদ্ধি কাবুলীও এ সুযোগ গ্রহণ করিতে ভুল করিল না। সে লম্বা লাঠীখানা ফেলিয়া দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

কাবুলী পলায়ন করিলে সকলে অসীমকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং বিজয়ী সেনাপতির মতই তাহার উপর অজস্র স্তুতিবাদ বর্ষণ করিতে লাগিল।

একজন বুড়া হিন্দুস্থানী অসীমের কাছে সরিয়া আসিয়া আধাহিন্দী আধাবাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুজী কি বারিষ্টার সাহেবের লোক, বক্তৃতা করতে এসেছেন?

অসীম কৌতুহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল,—কে বারিষ্টার সাহেব—?

জনৈক যুবক কহিল,—কে আর? রুদ্র সাহেব—তিনিই তো গরীবের মা বাপ!

বুড়া হিন্দুস্থানী বিরক্তিভরে বলিল,—গরীবের মা বাপ, না, আরো কিছু! ও সব 'মিঠাবাত বলনেওয়ালা' বাবুদের অনেক দেখেছি—!

যুবক উত্তেজিত স্বরে কহিল,—খবরদার দেবী সিং,—রুদ্র সাহেবের নিন্দা করলে, জিভ টেনে বের করবো—!

বৃদ্ধও চটিয়া গিয়া বলিল,—উঃ বড় যে আস্পর্দ্ধা, আয় দেখি, কেমন জোয়ান তুই—

চারিদিক হইতে 'হাঁ হাঁ' করিয়া লোক ছুটিয়া আসিল এবং শীঘ্রই দুই দলে বিভক্ত হইয়া দাঙ্গা বাধাইবার উপক্রম করিল!

অসীম অবাক হইয়া এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

এমন সময় কয়েকজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল,—ভাই সব জলদী চল, জলদী চল, রুদ্র সাহেব এসেছেন—

জনতা 'রুদ্র সাহেব কী জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কলহ ও দাঙ্গা ভুলিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিল।

অসীমও কৌতুহলী হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

বিস্তীর্ণ ময়দান—লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই জনতার সমগ্র অংশ ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। কেবল মশালের আলোকে দুই এক স্থান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া তাহার বিপুলতার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছিল মাত্র। মনে হইতেছিল, যেন একটা বৃহৎ অজগর সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া সেই অন্ধকার প্রান্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। জনতা হইতে যে কলরব উঠিতেছিল, তাহা বহুদূরাগত সমুদ্রকল্লোলের মতই শোনা যাইতেছিল।

সভাস্থলের মধ্যে একস্থানে একটা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহার উপরে দুইখানি আসন,—বোধ করি গণপতি ও সুপ্রভার জন্য। সুপ্রভা ও গণপতিকে লইয়া একটা সুদীর্ঘ মিছিল সভাস্থলে প্রবেশ করিলে, বিশাল জনসমুদ্রের চারিদিক হইতে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল।

গণপতি প্রথমে নিজে মঞ্চের উপরে উঠিলেন, তারপরে সুপ্রভাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া একটা আসনে বসাইয়া দিলেন। অন্য একখানি আসন নিজে অধিকার করিলেন। দুইজন মশালধারী তাঁহাদের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল।

অসীম মঞ্চের অদূরে জনতার মধ্যে একস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। সুপ্রভাকে ইতিপূর্ব্বে সে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই, এইবার মশালের আলোকে মঞ্চের উপরে গণপতির পার্শ্বেই সুপ্রভাকে দেখিয়া তাহার মনে বিস্ময় ও কৌতুহলমিশ্রিত একটা ভাবের

উদয় হইল। সুপ্রভাকে সে চিনিত, যদিও তাহার সঙ্গে কোন দিন সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। শিক্ষিতা মহিলা বলিয়া তাহার খ্যাতিও ছিল বটে। কিন্তু বাহিরের কাজে সে কোন দিন তাহাকে যোগ দিতে দেখে নাই। সেই সুপ্রভা আজ হঠাৎ প্রকাশ্য জনসভায় আসিল কেন এবং গণপতির সঙ্গে তাহার এমন ঘনিষ্ঠতাই বা হইল কিরূপে?

কিন্তু শ্রমিকেরা যখন পরম উৎসাহে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, তখন অসীমের মনও যেন একটা নূতনভাবের বিদ্যুৎস্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিল!

একজন প্রবীণ উকিল সভাপতি হইবেন কথা ছিল, শ্রমিকদের নেতৃত্ব করিবার তাঁহার নাকি খুবই সখ,—কিন্তু কাজের সময়ে তাঁহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। শুনা গেল, কলের একজন মালিক তাঁহার কাণে এমন মন্ত্র দিয়াছিলেন যে, তিনি কিছুদিনের জন্য একেবারে অদৃশ্য হইলেন। অবশেষে একজন দেউলিয়া ঠিকাদার সভাপতির আসনে বসিয়া শ্রমিকদের অনুগৃহীত করিলেন।

সভাস্থল নিস্তব্ধ, কেবল মাত্র একটা অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপুল জনতার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—ভাই সব, আমি নেতা নই, বক্তাও নই। যিনি নেতা, যাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য তোমরা এসেছ, তাঁর পরিচয় তোমাদের কাছে দিতে যাওয়া, প্রদীপের আলোকে সূর্য্যকে দেখানোর মতই ধৃষ্টতা! এত বড় লোক হয়ে তিনি যে গরীবের কথা ভাবেন,

এই তো তাঁর অসাধারণ মহত্ত্ব! আমাদের সৌভাগ্য যে, তাঁকে আমরা পেয়েছি। কিন্তু আজ তার চেয়েও বড় সৌভাগ্য,—স্বয়ং করুণাময়ী দেবী আমাদের সভায় পদার্পণ করেছেন। এ আমাদের আশার অতীত। শাস্ত্রে বলে মেয়েরা সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ। সেই সাক্ষাৎ ভগবতী ভূ-ভার হরণের জন্য আমাদের মধ্যে আজ অবতীর্ণা হয়েছেন। তোমরা সকলে তাঁর জয়ধ্বনি কর—

বিপুল জনতা তৎক্ষণাৎ—"জয় মাইজীকী জয়!" রবে চারিদিক কম্পিত করিয়া তুলিল।

সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে, সভার প্রধান বক্তা গণপতি উঠিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ধরিয়া চারিদিকে প্রবল জয়ধ্বনি ও করতালির শব্দ হইতে লাগিল। গণপতি সস্মিত মুখে দাঁড়াইয়া জনতার সেই সম্বর্দ্ধনা উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সভাস্থল নীরব হইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। গণপতির সেই "ওজস্বিনী, অনলবর্ষী" বক্তৃতার যথাযথ বর্ণনা করিবার ক্ষমতা কোন লেখকের নাই। সুদক্ষ অভিনেতার মত ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন, কখন রৌদ্র, কখন শান্ত, কখন করুণ ভাবের বিকাশ, হস্তপদের বিচিত্র ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের আরোহণ অবরোহণ—সত্যই চিত্তোন্মাদকর। জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার সেই বক্তৃতা যেন পান করিতে লাগিল,—কখন কখন উত্তেজিত হইয়া প্রবল উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল।

—ভাই সব আমি বক্তৃতা করতে আসিনি, বক্তৃতা করবার সময়ও আর নেই, এখন সত্যকার কাজে নামতে হবে।

আমাদের সম্মুখে আজ সকলের চেয়ে বড় সমস্যা—অন্নসমস্যা আমি বলি একমাত্র সমস্যা! এর সমাধান না হলে দেশ সমাজ সব রসাতলে যাবে! সমাজের উন্নতিই বল, আর দেশের স্বাধীনতাই বল,—কিছুই সম্ভব হবে না! অথচ এত বড় সমস্যার জন্য কেউ ভাবছে না, সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত! এই যে আমরা লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী মজুরের দল,—আমরা খেতে পাই না কেন, পরণে কাপড় নাই কেন,—আমাদের ছেলেমেয়েরা রোগে অনাহারে মরে কেন? আর সমাজের অকর্ম্মণ্য ধনীর দল—আকণ্ঠ বিলাসের পঙ্কে মগ্ন,—তাদের বড় বড় প্রাসাদ, দৈত্যপুরীর মত, ক্রমেই অহঙ্কারে গগন ভেদ করে উঠছে,—ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে এরা বিশ্বশুদ্ধ লোকের চোখ ঝলসে দিচ্ছে,—নিজেদের জয়রথচক্র সমাজের নির্য্যাতিত নিষ্পেষিতদের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! বন্ধুগণ, এই অন্যায়, এই বৈষম্য—অত্যাচার অনাচার—আমরা কি নীরবে সহ্য করবো? কখনই নয়। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দেহের রক্ত জল করে ধন উৎপাদন করবো,—আর ধনীরা বসে বসে নিশ্চিন্ত আরামে তাই উপভোগ করবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। সময় এসেছে,—তাদের বলতে হবে, এ সব খাম খেয়ালী ব্যবস্থা—স্বেচ্ছাচার আর চলবে না। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার চাই, পরিশ্রমের যোগ্য মূল্য চাই,—“অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, চাই মুক্ত বায়ু!” যদি তারা সহজে দিতে রাজী না হয়, আমরা হাত গুটাবো;—দেখবে, এক মুহূর্ত্তেই এই তাসের ঘর ধূলিসাৎ হয়ে পড়বে, কারখানার কলকব্জা অচল হবে, বিলাস ভবন কারাগার হয়ে উঠবে, ঐশ্বর্য্যময় নগর,

অরণ্যে পরিণত হবে! বন্ধুগণ, আমরা সামান্য নই, প্রচণ্ড শক্তির আধার, ঘুমন্ত বিসুবিয়সের মত! যে দিন নিজের শক্তি আমরা বুঝতে পারবো, বিসুবিয়স জেগে উঠবে,—সেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্‌টে যাবে—!

সভাস্থলে ঘন ঘন করতালি ও উল্লাসধ্বনি হইতে লাগিল। লোকে বক্তৃতা শুনিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। কেবল ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া অসীমের মনে হইল,—মোটরবিহারী, আকণ্ঠ বিলাসে মগ্ন—গণপতির মুখে এই বক্তৃতা কেমন যেন বিসদৃশ শুনাইতেছে!

সভাস্থল পুনরায় নীরব হইল। এইবার 'মাইজীর' বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়া উঠিল। সভাপতি গণপতিকে মৃদুস্বরে কহিলেন,—'মাইজীকে' কিছু বলতে হবে।

সুপ্রভা সেই লোকারণ্যের মধ্যে যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল। লোকের উল্লাস, কোলাহল, জয়ধ্বনি—কিছুরই প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না। গণপতির অনুরোধ শুনিয়া সে প্রথমে চমকিত হইল,—পরক্ষণেই লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সসঙ্কোচে কম্পিতকণ্ঠে জানাইল,—বক্তৃতা করিতে সে পারিবে না!

গণপতি কহিলেন,—সে কি হয়, মিসেস মিত্র! হাজার হাজার লোক আপনার কথা শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, এদের কি নিরাশ করা যায়!

সুপ্রভা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল যে, সে অন্তঃপুরবাসিনী নারী, কোন সভায় কোন দিন বক্তৃতা করে নাই,—এ তাহার পক্ষে অসাধ্য!

কিন্তু গণপতি কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, পুনঃ পুনঃ সাগ্রহে সুপ্রভাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সভাপতিও করজোড়ে সবিনয়ে 'মাইজীকে' প্রার্থনা জানাইলেন!

সুপ্রভাকে অগত্যা বক্তৃতা করিবার জন্য উঠিতে হইল। কিন্তু উঠিয়াই তাহার পা কাঁপিতে লাগিল,—বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল,—গলা শুকাইয়া আসিল। সেই বিশাল জনসঙ্ঘের দিকে চাহিয়া, তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইতে চাহিল না,—কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, কিছুক্ষণ বিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল।—তবু কিছু বলিতেই হইবে,—যদি কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ সে বসিয়া পড়ে, সেও যে অপরিসীম লজ্জার কথা!

সহসা তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—ভয় কি—আমি আছি! সুপ্রভার সর্ব্বশরীর পুলকে শিহরিয়া উঠিল! মনে অননুভূতপূর্ব্ব একটা বল আসিল,—আর কিছুমাত্র না ভাবিয়া ভাবাবিষ্টবৎ সে বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথমে তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু, অস্পষ্ট—প্রভাত-বিহঙ্গের প্রথম কাকলীর মত, প্রণয়ভীরু নববধূর প্রথম সম্ভাষণের মতই শ্রুত হইল;—ক্রমে তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। অবশেষে নারীকণ্ঠের সুস্পষ্ট, মধুর, সঙ্গীতময় স্বরলহরীতে, সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল! চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, লোকারণ্য যেন সেই অপূর্ব্ব স্বরলহরীর মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া গেল।

সুপ্রভা কহিল,—আমি অন্তঃপুর বাসিনী নারী, লোকসভায় কথা বলতে জানি নে। কিন্তু মুখে আমার ভাষা না থাকলেও, আমার সমস্ত হৃদয় তোমাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা অনুভব করছে!

এই যে সর্ব্বত্র ক্ষুধার্ত্তের কাতর আর্ত্তনাদ, শিশুর অকালমৃত্যু, মাতার জীবন্ত আহুতি, যদি আমার শক্তি থাকত, এক মুহূর্ত্তে এ সব দূর করে দিতাম। আজ এই সভায় আমার সম্মুখে যারা আছে, তাদের শীর্ণদেহ, মলিনমুখ, হতাশ দৃষ্টি দেখে, নারী আমি—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এই অসীম দুঃখমোচনের কি কোন উপায় নেই? উপায় আছে এবং সে আমাদেরই হাতে! আমরা যদি আমাদের দুঃখ দূর করবার জন্য জীবনপণ করি, কেউ আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না! আমার মন বলছে, সেই জীবন মরণ সংগ্রামের দিন অদূরে এবং সে দিনের সে সংগ্রামে নারীরাও উদাসীন থাকবে না। আমরা মা, সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য আমরাও অগ্রসর হব—

'জয় মাইজীকী জয়'—ভীষণ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস যেন বিদীর্ণ হইল, অসীমও নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই জয়ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইল।

উত্তেজনায় ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সুপ্রভা বসিয়া পড়িল।

গণপতি সমস্ত নয়নমন দিয়া সুপ্রভার বক্তৃতা যেন পান করিতেছিলেন। কথা বলিবার সময়, উত্তেজনায় সুপ্রভার ঈষৎ আরক্ত মুখমণ্ডল, দীপ্তিময় চক্ষু, স্ফুরিত নাসা ও অধর, উজ্জ্বল ললাট, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী, বাতাসে চঞ্চল অলকদাম,—একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে গণপতি স্থানকাল সব ভুলিয়া গেলেন। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ, সেই সভা, কিছুই তাঁহার মনে রহিল না!—যেন অনাদি অনন্তকালের মধ্যে তিনি ও সুপ্রভা, আর কেহ নাই, কিছু নাই! সুপ্রভা যখন বসিল, তখন গণপতির চমক ভাঙ্গিল। তিনি একজন

তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের হাত হইতে তাড়াতাড়ি একখানা পাখা টানিয়া লইয়া নিজেই ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্তললাট সুপ্রভাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত ভাবমুগ্ধ জনতা পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সভা ভাঙ্গিবার পর, গণপতি যখন হাত ধরিয়া সুপ্রভাকে গাড়ীতে তুলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি যেন তাঁহার নিজের সাধনার বলে এই অধিকার লাভ করিয়াছেন; গাড়ীতে বসিয়া সুপ্রভাও একটা স্বস্তি ও আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলিল। জীবননাট্যের এই নূতন অধ্যায় কি অপূর্ব্ব পুলক-চঞ্চল, উৎসাহের মাদকতায় মধুর!

কিন্তু সভাভঙ্গের পরও লোকে গণপতি ও সুপ্রভাকে ছাড়িল না। তাহারা তাহাদের সুখদুঃখের কথা একান্তে বলিতে চায়। নিকটেই ডাকবাংলা, পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি করিতে করিতে গাড়ী টানিয়া গণপতি ও সুপ্রভাকে তাহারা সেইখানে লইয়া গেল।

অনশনক্লিষ্ট, অর্দ্ধ-উলঙ্গদেহ মজুরের দল আসিল, তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের কথা কাতরকণ্ঠে গণপতিকে নিবেদন করিল। দলে দলে মেয়েরা আসিয়া "মাইজীকে" ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহাদের সরল হৃদয়ের শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস দেখিয়া সুপ্রভা মুগ্ধ হইল। এইরূপে লোকের ভীড় কমিতে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল।

ডাকবাংলার বারান্দায় দুইখানি আরাম কেদারায়—সুপ্রভা ও গণপতি পাশাপাশি বসিয়াছিল। সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর। তাহার শেষে গঙ্গার তটরেখা দেখা যাইতেছিল। গঙ্গার শীকর-শীতল বাতাস আসিয়া তাহাদের ক্লান্ত দেহ জুড়াইয়া দিতেছিল।

তখনও জ্যোৎস্না উঠে নাই, কেবল কয়েকটি নক্ষত্র তাহাদের ক্ষীণ কিরণ বিকীর্ণ করিতেছিল। গণপতি ও সুপ্রভা উভয়েই সেই স্বল্পান্ধকারে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। অবশেষে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গণপতি কহিলেন—

—মিসেস মিত্র, আজকার দিনটা কেমন লাগল?—বেশ একটু 'অ্যাডভেঞ্চার' হল, নয়?

সুপ্রভা মৃদু হাসিয়া কহিল,—সত্যি ভাল লাগল! মেয়েদের জীবনটা যে একেবারে তুচ্ছ নয়, তাদের দ্বারাও কিছু কাজ হতে পারে, এই কথাটাই আজ আমার মনে হচ্ছিল—!

গণপতি উৎফুল্লভাবে কহিলেন,—আপনাকে পেয়ে লোকের মনে যে আনন্দ ও উৎসাহ জেগেছে, সে আর কি বলবো! আমি একা এলে এর দশভাগের একভাগ কাজও হত না—!

সুপ্রভার হৃৎপিণ্ড আনন্দে দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, সে আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল,—সত্যি কি আপনি তাই মনে করেন, মিঃ রুদ্র?

—মনে করবো কি, সে তো চোখে দেখলাম! আপনিও কি তা অনুভব করেন নি, মিসেস মিত্র?

সুপ্রভা একথায় কোন উত্তর না দিয়া সলজ্জভাবে হাসিতে লাগিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গণপতি কহিলেন,—এইবার চলুন, ওঠা যাক, বেশী রাত হলে মিঃ মিত্র আবার ভাববেন। একেই তো তাঁর কাছ থেকে আপনাকে প্রায় কেড়ে এনেছি,—আসতে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না—

বলিয়া গণপতি ঈষৎ বক্রভাবে হাসিলেন।

সুপ্রভার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ব্যথিত স্বরে সে কহিল,—এদেশের মেয়েদের অদৃষ্ট এমনই বটে! তাদের চারধারেই কেবল সংশয় সন্দেহের ছায়া। যেন বাহিরের আলো বাতাসটুকু পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করবার অধিকার তাদের নেই—!

মানুষ ভাবে এক, ঘটনার গতি হয় অন্যরূপ!

আকাশের এক কোণে একখণ্ড কালো মেঘ যে কখন হইতে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা তাহারা কেহই লক্ষ্য করে নাই। সহসা বেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, দূর হইতে আগত একটা 'সোঁ সোঁ' শব্দ ক্রমেই নিকটতর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তারপর আসিল প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি! —সঙ্গে সঙ্গে বজ্রগর্জ্জন ও বিদ্যুৎস্ফুরণ! কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই যে, এই সান্ধ্যপ্রকৃতির শান্ত মাধুর্য্য ধরণীতল স্নিগ্ধ করিয়াছিল, এখন তাহার রুদ্ররূপ দেখিয়া কে তাহা কল্পনা করিতে পারে? যাহারা সভাস্থল হইতে গণপতি ও সুপ্রভার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা যে যেখানে পারে আশ্রয়লাভের জন্য পলায়ন করিল। ডাক বাংলার ভৃত্যেরাও নিজেদের কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইল। মোটর চালক বেগতিক দেখিয়া, গাড়ীখানি ঘুরাইয়া নিরাপদ স্থানের সন্ধানে যাত্রা করিল।

ডাকবাংলার বেহারা আসিয়া কহিল,—হুজুর, ঘরের ভিতরে চলুন, এ ঝড় বৃষ্টি সহজে থামবে না!—বলিয়া সে আরাম কেদারা দুইখানি টানিয়া ভিতরে লইবার প্রস্তাব করিল। সুপ্রভা ও গণপতি অগত্যা ব্যস্তভাবে উঠিয়া বাংলার ভিতরে প্রবেশ করিল।

বাহিরে মেঘগর্জ্জন, ঝটিকার হুঙ্কার এবং প্রবল বারিপাতের শব্দ শোনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা ঝাপটা

আসিয়া রুদ্ধ দরজা জানালার রন্ধ্রপথে হানা দিতেছে! ভিতরে সুপ্রভা ও গণপতি নীরবে বসিয়া প্রকৃতির এই রুদ্র তাণ্ডব দেখিতেছে। উভয়েই চিন্তামগ্ন,—এই আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপ্লব তাহাদের জীবননাট্যের গতি কোন অজ্ঞাত পথে লইয়া যাইবে, তাহাদের অবচেতন মন তাহাই কি ভাবিতেছিল?

সহসা একবার ভীষণ বজ্রপাতের শব্দে চরাচর কম্পিত হইয়া উঠিল। বিদ্যুতের অট্টহাস্য জ্বালাময় দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। সুপ্রভা দুই হাতে চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া অস্ফুট চীৎকার করিল,—"মাগো—" তারপর পার্শ্বে উপবিষ্ট গণপতির একখানি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল।

গণপতি উদ্বেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—ভয় কি মিসেস মিত্র, ভয় কি?

সুপ্রভা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল—তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—ভয় পাইনি, তবে এমন দুর্যোগ আমি কখনও দেখিনি! কি যে হবে—

—না—না, ভয়ের কিছু নেই, দুর্যোগ এখনই কেটে যাবে—

বলিয়া গণপতি সুপ্রভাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু "দুর্যোগ শীঘ্র কাটিয়া যাইবার" কোন লক্ষণ দেখা গেল না। উদ্দাম প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা সমভাবেই চলিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ঝড়বৃষ্টির বেগ একটু কমিল বটে, কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইল না। আকাশ তখনও ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার!

বেহারা আসিয়া সেলাম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হুজুর এই রাত্রে সহরে ফিরবেন কি ?

গণপতি সচকিত ভাবে বলিলেন,—হাঁ, হাওয়া গাড়ী ডাক—!

বেহারা পুনর্ব্বার সেলাম করিয়া জানাইল, হাওয়া গাড়ী সেখানে নাই, বোধ হয় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভার অন্য কোথাও গিয়েছে।

সুপ্রভা ও গণপতি উভয়েই পরস্পরের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন আপন মনেই কহিলেন,—তাহলে উপায় কি,—হয়ত আজ রাত্রে এইখানেই থেকে যেতে হবে—!

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইল, কাজটা কি ঠিক হইবে ? রাত্রি বেশী হইয়াছে বটে, তবু এই রাত্রেই তাহাদের কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া চাই! সঙ্গে সুপ্রভা আছেন,—এই ডাক বাংলায় রাত্রিযাপন করা অত্যন্ত অশোভন হইবে! সুপ্রভা নিজেও এই ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন না। মিঃ মিত্রই বা কি মনে করিবেন ? আর, সমস্ত রাত্রি উদ্বেগে ও সংশয়ে তাঁহার মেয়ে সবিতার ঘুম হইবে না।…না, রাত্রিতে এখানে থাকা কিছুতেই চলিতে পারে না ?…

সহসা সুপ্তোত্থিতের মত সুপ্রভার দিকে চাহিয়া একটু জোরের সঙ্গেই গণপতি কহিলেন,—যত রাত্রিই হোক, আজই আমরা কলকাতায় ফিরব, কিছু ভাববেন না, মিসেস মিত্র—!

সুপ্রভা ইহার কোন উত্তর দিল না। তাহার অন্তরেও বিষম

চিন্তার ঝড় বহিতেছিল। এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা, ইহাতেই হয়ত লোকে কত কি বলিবে,—তারপর যদি গাড়ী না পাওয়া যায়, যদি এই ডাকবাংলাতেই বাধ্য হইয়া রাত্রিবাস করিতে হয়, তবে···! লজ্জায় আর কাহারও কাছে সে মুখ দেখাইতে পারিবে না।···এই ভাবে মিঃ রুদ্রের সঙ্গে আসিয়া সে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছে, না আসিলেই ভাল হইত—!

বেহারা গণপতির হুকুম পাইয়া মোটর গাড়ীর সন্ধানে গেল। গণপতি ও সুপ্রভা উভয়েই পথের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ক্রমে পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল,—মোটর গাড়ীর আর দেখা নাই! অধীর উৎকণ্ঠায় উভয়েরই মনে হইতে লাগিল,—যেন দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রতীক্ষার আর শেষ নাই—!

প্রায় এক ঘণ্টা পরে গাড়ী না লইয়াই ড্রাইভার আসিয়া হাজির হইল। ক্রুদ্ধ বিরক্ত গণপতি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে ভয়ে ভয়ে কহিল,—গাড়ী বিগড়ে গেছে, হুজুর,—এ রাত্রে আর চলতে পারবে না—!

গণপতি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—সে কি! কলকাতায় যে আজ রাত্রেই ফিরতে হবে—! যেমন করে হোক গাড়ী ঠিক কর—

ড্রাইভার সবিনয়ে জানাইল, সে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, গাড়ী কিছুতেই ঠিক হইল না, সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই!

গণপতি হতাশভাবে বলিলেন,—তা'হলে একখানা ভাড়া ট্যাক্সি নিয়ে এস—

—না হুজুর, এ কলকাতার সহর নয়, এত রাত্রে ভাড়া ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না—

—কলকাতা ফেরবার কোন ট্রেণ আছে ?

—না, হুজুর এখন কোন ট্রেণও নাই, তা ছাড়া রেল ষ্টেশন এখান থেকে প্রায় তিন মাইল পথ—!

গণপতি অধীর ভাবে বাংলার বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিলেন।···তাইতো, আজ রাত্রে কি এই ডাকবাংলাতেই থাকিতে হইবে ?···সঙ্গে সুপ্রভা ? না না, এ ঠিক নয়, ঠিক নয় !···

নিতান্ত অপরাধীর মত সুপ্রভার নিকটে গিয়া বলিলেন,—মিসেস মিত্র, সবই তো শুনলেন,—এখন কি করা যায় !

সুপ্রভা ধীর শান্ত স্বরে কহিল,—কলকাতায় ফেরা যখন সম্ভব নয়, তখন এখানেই থাকতে হবে। আর এই দুর্যোগে, অন্ধকার রাত্রে অসাধ্যসাধন করে যেতেই হবে, এমনই কি কথা—!

গণপতি সুপ্রভার উত্তর শুনিয়া,—ততোধিক তাহার শান্ত অবিচলিত ভাব দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ডাকবাংলায় রাত্রিযাপনের প্রস্তাব শুনিয়া সুপ্রভা বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে, হয়ত সে কলিকাতা ফিরিবার জন্য জিদ ধরিয়া একটা অনর্থ বাধাইয়া তুলিবে ! কিন্তু একি, সুপ্রভা তো সে সব কিছুই করিল না ! বরং তাহার বিপরীত !—যেন তাহার মনে কোন উদ্বেগই হয় নাই !

উদ্বেগ সুপ্রভার মনে খুবই হইয়াছিল, এমন কি, সে আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতেছিল। কিন্তু ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলিবার পর, গণপতির উদ্বেগকাতর দৃষ্টি, কুণ্ঠিত অপরাধীর মত মুখভাব, হতাশ ব্যাকুলতা দেখিয়া সহসা তাহার মনোজগতে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল! ...নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ কি এমনই কদর্য্য? কোন বিষাক্ত জিনিষ সঙ্গে রাখিতেও তো লোকে এত ভয় পায় না! আজ যদি কোন পুরুষবন্ধু গণপতির সঙ্গে থাকিতেন, তবে তো তাঁহার কোন চিন্তাই হইত না। আর সে নারী বলিয়াই সমস্যা এত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে! নারী কি এতই নিকৃষ্ট জীব, নিজের মর্য্যাদারক্ষা করিবার এতটুকু ক্ষমতাও কি তাহার নাই? গণপতির একদিনের একটা কথা তাহার মনে পড়িল। —নারীর কাছে পুরুষ ঠিক যেন রক্তলোলুপ হিংস্র পশু, সর্ব্বদা তাহাকে সভয়ে আত্মরক্ষা করিতে হয়! না,—নারীত্বের এ ঘৃণ্য অপমান সে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না......লোক নিন্দার ভয়! সে ভয়ও আজ সে ত্যাগ করিবে!

গণপতি সুপ্রভার মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! তিনি তাহার উত্তর শুনিয়া দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—আমার এমন অভ্যাস আছে, যেমন করে হোক, রাত কেটে যাবে। কিন্তু আপনার তো খুবই কষ্ট হবে—মাত্র দুটী ঘর—

সুপ্রভা মৃদু হাসিয়া কহিল,—আপনি যদি একরাতের জন্য কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করতে পারেন, আমিই বা পারবো

না কেন? দুটো লোকের বিশ্রামের পক্ষে দুখানা ঘরই যথেষ্ট—!

ইহার পর কি বলিবেন, বুঝিতে না পারিয়া গণপতি নীরব হইয়া রহিলেন।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। বেহারা আসিয়া বিনীতভাবে সেলাম করিয়া জানাইল—সে দুই ঘরে স্বতন্ত্রভাবে দুইখানি খাটে শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। হুজুর যদি হুকুম করেন, তবে এক ঘরেই খাট দুখানা জুড়িয়া দেয়।

সুপ্রভার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হইয়া উঠিল, পরক্ষণে তাহার মুখ মড়ার মত সাদা হইয়া গেল! গণপতির সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি বেহারার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দ্বারপ্রান্ত দেখাইয়া দিয়া রুক্ষ স্বরে কহিলেন,—যাও—!

সরলপ্রকৃতির বেহারা কিছু বকসীস পাইবার আশাতেই কথাগুলি বলিয়াছিল! কিন্তু ফল তাহার বিপরীত হইল দেখিয়া সে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইল! বেচারা বুঝিতে পারিল না যে, সে কি অপরাধ করিয়াছে! নিজের কুটীরে গিয়া শয্যায় শয়ন করিবার পূর্ব্বে শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিল যে, এই বাঙ্গালী সাহেব মেম দুই জনেরই মাথার কিছু গোলমাল আছে!

গণপতি ও সুপ্রভা উভয়েই অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে অপ্রতিভের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মূর্খ বেহারার সামান্য কয়েকটা কথা, অন্ধকারে বিদ্যুৎদীপ্তির মত তাহাদের প্রকৃত অবস্থাটা চোখের সম্মুখে এমন ভাবে তুলিয়া ধরিল, যে, তাহারা দুইজনেই

মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল! সুপ্রভা কিছুকাল পূর্ব্বে মনে যে-দৃঢ়তা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবল চেষ্টায় সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া গণপতি কহিলেন,—আপনি যান, বিশ্রাম করুন গে,—রাততো আর বেশী নেই—

দুই ঘরের মধ্যে একটী দরজা। সুপ্রভা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে গণপতিও আলো নিভাইয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।—কিন্তু তাঁহার কিছুতেই ঘুম আসিল না, যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল।

পাশের ঘরেই সুপ্রভা শুইয়া আছে, মধ্যে মাত্র একটী দরজার ব্যবধান,—একথা ভাবিতেই তাঁহার হৃৎপিণ্ড কি একটা অজ্ঞাত উত্তেজনায় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—অবচেতন মন বলিল,—এত কাছে, তবু এত দূরে,—এই ব্যবধান দুর করিবার যদি কোন উপায় থাকিত!...পাশের ঘর হইতে ঘুমন্ত সুপ্রভার সমতালে মৃদু নিঃশ্বাসপতনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। আশ্চর্য্য এই নারী! গণপতির চক্ষে নিদ্রা নাই, আর সে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! তাহার মনে কি কোন উদ্বেগ বা আশঙ্কা নাই, হৃদয়ের অতিগোপন স্তরেও লেশমাত্র ছায়াও কি পড়ে নাই?

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, গণপতি নিজের রুদ্ধ কামনার তুষানলে ক্রমেই অধিকতর দগ্ধ হইতে লাগিলেন!

প্রায় শেষ রাত্রে দুর্যোগ কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, চন্দ্রালোকে চারিদিক আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল। উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া জ্যোৎস্নাধারা আসিয়া গণপতির কক্ষ প্লাবিত করিয়া দিল। গণপতি বিনিদ্রনয়নে শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বাহিরে বারান্দায় আসিয়া অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এই জ্যোৎস্নালোক কি তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা শান্ত করিতে পারে না!

সুপ্রভার কক্ষের জানালা খোলা ছিল। সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতে, জ্যোৎস্নালোকে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য গণপতির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার দেহের শিরায় শিরায় পুলক প্রবাহ বহিল, সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্মোহিত হইল! ঘুমন্ত সুপ্রভার দেহভার শুভ্রশয্যার উপরে বিন্যস্ত, যেন অমলধবল একরাশি মল্লিকার মালা কোন নিপুণ শিল্পী সেখানে সাজাইয়া রাখিয়াছে। পরিপূর্ণ যৌবন সেই দেহের সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না ধারায় উছলিয়া পড়িতেছে,—ভাদ্রের ভরাগঙ্গা পূর্ণিমা রজনীতে যেন ফুল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। শুভ্র উপাধানে ঘুমন্ত মুখখানি নিমীলিত কমলদলের মতই অনুপম সুন্দর! শিথিল কেশপাশ বাহুমূলে, কপোলে, ললাটে ছড়াইয়া পড়িয়া সেই মুখের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ঈষৎস্খলিত বসনের অন্তরাল হইতে উন্নত বক্ষের সুষমা ব্যক্ত হইতেছে।

চন্দ্রালোকে জোয়ারের আকর্ষণে সমুদ্রের জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, গণপতির সমগ্র হৃদয় এই ঘুমন্ত রূপরাশির আকর্ষণে তেমনই আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাঁহার দেহের প্রত্যেক রক্ত কণিকা, শিরা উপশিরা, হৃদয়ের তন্ত্রী, মর্ম্মের কোষ যেন অধীর উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া গিয়া ঐ রূপরাশিকে আলিঙ্গন করিতে চাহিল,—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া উহার মাধুরীকে নিঃশেষে নিঙড়াইয়া পান করিতে উদ্যত হইল! এই রূপরাশি তো এখন সম্পূর্ণ তাহারই অধিকারে, তাহারই আয়ত্তের মধ্যে! তবে কেন সে এই সুখের আস্বাদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে? দুর্নীতি—পাপ? কিসের পাপ—কিসের দুর্নীতি? মানুষের দেহের ধর্ম্ম, হৃদয়ের ধর্ম্মকে এই ভাবে জোর

করিয়া চাপিয়া রাখাই তো ঘোর অন্যায়, অত্যাচার। লোকলজ্জা, কলঙ্ক?—হয় হোক, সে তাহা গ্রাহ্য করে না·········!

এমন সময় সুপ্রভা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরিল, একবার ঈষৎ উন্মুক্ত চক্ষে তাহারই দিকে চাহিল। গণপতির মনে হইল, সুপ্রভার ঘুমন্ত অধরে বুঝি বিদ্রূপহাস্যের একটা অস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিল।······

গণপতির রক্তের উত্তেজনা একটা প্রবল বাধা পাইয়া মন্দীভূত হইয়া আসিল।···সহসা তাহার মনে হইল, এই নারী, সে তো তাহারই উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া শিশুর মত অকাতরে ঘুমাইতেছে, তাহারই পৌরুষের দুর্গের মধ্যে সে তো আজ আশ্রয় লইয়াছে। গণপতি কি হীন কাপুরুষের মত সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে—নিজের পৌরুষের অপমান করিবে? না—না—সে তাহা পারিবে না! কিন্তু—কিন্তু যদি সুপ্রভার নির্লিপ্ত হৃদয় আজ এই এক রাত্রির জন্য ভালবাসায় কোমল হইত, যদি সে একবার এই নির্ম্মম নীতির বন্ধনকে একটু শিথিল করিত!······সেকি সুপ্রভাকে জাগাইবে, তাহাকে ডাকিবে?···

সুপ্রভার ঘুমন্ত মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল,—ভ্রূযুগ কুঞ্চিত, ললাট রেখাঙ্কিত হইল;—বোধ হয় ঘুমের ঘোরে সে কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। গণপতির বুক কিন্তু অপরাধীর মত কাঁপিয়া উঠিল। সে আর সুপ্রভার শয্যার দিকে চাহিতে পারিল না, এমন কি জানালার নিকটেও দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস পাইল না! কম্পিতহৃদয়ে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে বারান্দার অন্য একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।

চারিদিকে নির্জ্জন নিস্তব্ধ, শান্ত পল্লীগুলি জ্যোৎস্নালোকে ঘুমন্ত পুরীর মত বোধ হইতেছে,—দূরে গঙ্গার কূলে দিগন্তরেখা কোন রহস্যলোকের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে! কিন্তু গণপতির কাছে আজ এ সব সৌন্দর্য্যের কোন মূল্য নাই,—তাহার অন্তর্জ্জগতে যে আগ্নেয়গিরি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার জ্বলন্ত মুখ রুদ্ধ করিতেই তাহাকে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গেল,—পাখীরা তাহাদের নীড়ে অস্ফুট কাকলী ও পক্ষ সঞ্চালনের শব্দ করিতে লাগিল,—লোকালয় হইতে জাগরণের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল,—পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে অরুণ রাগরেখা ফুটিয়া উঠিল।

গণপতি তখনও বারান্দার একপ্রান্তে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন! প্রভাত বায়ুর শীতল স্পর্শে তাঁহার উত্তপ্ত ললাট একটুও স্নিগ্ধ হইল না!

প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সুপ্রভা গণপতির দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—একি মিঃ রুদ্র, আপনি কি সারারাত ঘুমোন নি? চোখমুখ বসে গিয়েছে, কে যেন সমস্ত মুখে কালি লেপে দিয়েছে! আপনার কি হঠাৎ কোন অসুখ করেছে—?

গণপতি এ প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার জন্য ম্লান হাসিয়া বলিলেন—আপনার বেশ ঘুম হয়েছিল,—মিসেস মিত্র?

সুপ্রভা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হয়েছিল, তবে মাঝে মাঝে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি! মনে হচ্ছিল, যেন একটা কালো ছায়া শয্যার আশে পাশে ঘুরছে—! তার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার

সর্ব্বাঙ্গ গ্রাস করতে চাইছে,—ক্লেদপঙ্কিল হাত সরীসৃপের মত আমাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছে!—কেন এমন হল বলুন তো?—

গণপতির অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। কে এই ছায়ামূর্ত্তি? গণপতি নিজে? সুপ্রভা কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছে?—না;—না, সম্ভব নয়—!

প্রকাশ্যে ম্লান হাসিয়া শুষ্কস্বরে গণপতি কহিলেন,—স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে? স্বপ্ন ছেড়ে এখন বাস্তব জগতে নেমে আসুন, যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিন, দশ পনর মিনিটের মধ্যেই মোটর আসবে—

সুপ্রভার চোখে তখনও সংশয়ের ছায়া, ললাটে চিন্তার রেখা,—যেন স্মৃতির গভীর স্তরে কি একটা বস্তু সে ধরিতে চাহিতেছে,—কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না—!

মাধুরীদের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে সবিতা আর যেন কোন কিছুতেই মন দিতে পারিতেছিল না। জলহারা মেঘ যেমন আকাশের কোথাও বাসা বাঁধিতে পারে না, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়,—সবিতার মনেরও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। তাহার জীবনের পটে কোথাও যেন একটা ছিদ্র হইয়াছে এবং সেই ছিদ্রপথে যত কিছু চিন্তা, কল্পনা, সঙ্কল্প সব উবিয়া পলাইতেছে।

অসীমের চিন্তা মন হইতে দূর করিবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মনকে কতবার বুঝাইতে চাহিয়াছে, অসীম তাহার কেহ নয়, ছেলেবেলায় ঘটনাসূত্রে তাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু এমন পরিচয় তো অনেকের সঙ্গেই হইয়া থাকে,—আবার জীবনের যাত্রা পথে কে কোথায় ভাসিয়া যায়! অসীম-দা তেমনই একজন, তার বেশী নয়। তবে সবিতা তাহাকে ভুলিতে পারিবে না কেন? অসীম-দা তো ইহারই মধ্যে তাহাকে এড়াইয়া বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে,—কোন কালে যে সবিতার উপরে তার লেশমাত্র ভালবাসা ছিল এমন লক্ষণও সে ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ করে না! সেদিন মাধুরীর গৃহে দুইজনে এত কাছে, মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—কই অসীম-দা ভুলিয়াও তাহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল না। নিতান্ত অপরিচিত যে, সেওতো এমন অসৌজন্য দেখাইতে

লজ্জা বোধ করে! আর সবিতা কিনা ভাবিয়াছিল অসীম-দা তাহাকে ভালবাসে! ভালবাসার এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হইতে পারে!···যেমন করিয়াই হোক, অসীম-দাকে তার ভুলিতেই হইবে,—সমস্ত জীবন ধরিয়া এই অপমানের স্মৃতি সে বহন করিতে পারিবে না—!

কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও অসীমকে ভোলা সবিতার পক্ষে অসম্ভব হইল। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক ছোটখাট ঘটনায়, অসীমের কথাই মনে পড়িত, তাহার জীবনের প্রত্যেক আঁকেবাঁকে যে অসীমের স্মৃতিই জড়িত রহিয়াছে, গৃহের চারিদিকে যে তাহারই চিহ্ন! ওই জানলার ধারে বসিয়া তাহারা কত দিন কত জটীল সমস্যা লইয়া তর্ক করিয়াছে! সবিতা অনেক সময়ই তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, হারিয়া গিয়া রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিত, অথবা ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইত। অসীম উচ্চহাস্য করিয়া তাহার পরাজয়ের জ্বালা আরও বাড়াইয়া দিত। বাগানের ঐ কোণে যেখানে কৃষ্ণ চূড়ার গাছ, সেখানে বসিয়া সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকে তাহারা কত দিন কাব্য আলোচনা করিয়াছে। বক্তা অধিকাংশ স্থলেই হইত অসীম, আর সবিতা তন্ময় হইয়া কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। গণপতির গ্রন্থাগারে, সবিতার পড়িবার ঘরে, অসীমের কত স্মৃতি মুদ্রিত হইয়া আছে। প্রতি বৎসর সবিতার জন্ম দিনে অসীম যে উপহার দিয়াছে, সবিতার শয়ন ঘরে, তাহা কত যত্নের সঙ্গে সাজানো রহিয়াছে। সেই অসীম-দাকে ইচ্ছা করিলেই কি ভোলা যায়!···তবু—তবু—তাহাকে আজ ভুলিতেই হইবে—!

আজ সকালে এই দুশ্চিন্তার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবিতা সেতার লইয়া বাজাইতে বসিয়াছিল। সেতার বাজনায় তাহার খ্যাতি ছিল। নিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে, সেতার সাড়া দিল বটে, কিন্তু বড় করুণ সুরে! তাহার ভিতরে যেন কত যুগের কত প্রাণের বিরহব্যথা রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই আজ হঠাৎ ছাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই করুণ রাগিণীর মূর্চ্ছনায় সবিতা নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল! একি তাহারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি,—অথবা তাহার আহ্বানে অদৃশ্য লোক হইতে তাহারা ভাসিয়া আসিতেছে!

সবিতা এই ভাবে কতক্ষণ নিজের সৃষ্ট সুরলোকেই ধ্যান মগ্ন হইয়া রহিল। হঠাৎ এক সময়ে ধ্যান ভাঙ্গিলে দেখিল, কবি অতুল কখন গৃহমধ্যে আসিয়াছে এবং তন্ময় ভাবে দাঁড়াইয়া তাহার সুরের আলাপ শুনিতেছে।

সবিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অপ্রস্তুত ভাবে কহিল,—একি অতুল বাবু যে, কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি জান্‌তেও পারিনি—!

অতুল নমস্কার করিয়া কহিল,—লজ্জার কথা কিছুই নয় সবিতা দেবী! রাজরাণী যদি দুহাতে ঐশ্বর্য্য ছড়ান, তবে ভিক্ষুকেরা তা কুড়িয়ে নেবেই—! সে কি তাদের অপরাধ—?

সবিতা সলজ্জ হাস্যের সঙ্গে বলিল,—ও আপনি যে আবার কবি,—শুধু কবি নন, তরুণ বাঙ্গলার একজন নামজাদা কবি! কিন্তু কবিরা যখন কাব্যচর্চ্চা ছেড়ে, ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করেন,

তখন দাতাদের পক্ষে একটু মুস্কিল হয়ে পড়ে যে! তাঁদের তো আর মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে বিদায় করা যায় না—

—ভয় নেই, আপনার মুষ্টিভিক্ষাও হীরাজহরতের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। আপনি যখন সেতার হাতে সুরের তরঙ্গ তুলেছিলেন, —তখন মনে হচ্ছিল, স্বয়ং বীণাবাদিনী সরস্বতীই বুঝি ভূতলে নেমে এসেছেন—

সবিতার মুখে ঈষৎ রক্তিমাভা খেলিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া সে কহিল,—কবিদের স্বভাবই অত্যুক্তি করা। সুতরাং আপনার কথার প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কিন্তু আপনার এই সরস্বতী-বন্দনা শুনে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী রুষ্ট হবেন না তো—?

—লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ পুরাতন প্রবাদ বটে, কিন্তু আমরা এ যুগের কবিরা ও-কথাটা মানতে চাই না,—দুই দেবীকেই প্রসন্ন রাখতে চাই—

সবিতা শ্লেষের সুরে কহিল,—সে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করবেন না, কবি! কালিদাস থেকে আরম্ভ করে চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত কেউ ওটা পারেন নি—!

অতুল ততক্ষণে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল,—জানেন তো ভিক্ষুকের স্বভাব,—তার আকাঙ্ক্ষার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। আপনার গান শুনে মনের তৃষ্ণা বেড়েই গিয়েছে। অতএব যদি অতিথি সৎকার করতে চান, সেতারটা আবার তুলে নিন—

সবিতা ঈষৎ হাসিয়া সেতারটা তুলিয়া লইল, সুরের তরঙ্গে

আবার সেই কক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল। যতক্ষণ গান চলিল, অতুল সম্মোহিতবৎ বসিয়া রহিল। গান শেষ হইলে সবিতা সেতার নামাইয়া বলিল,—আপনারই গান কবি—! বাবা আপনার গান শুনতে বড় ভালবাসেন। বলেন, আপনার গানে যে একটা নূতনত্বের ছাপ আছে, তা অস্বীকার করবার জো নেই। আমারও মনে হয়, অন্য অনেক কবির কবিতার মত, আপনার কবিতা জোড়তালি-দেওয়া, ধার-করা ভাবের সমষ্টি নয়,—এ যেন হৃদয়ের গভীর উৎস থেকে উঠেছে—!

অতুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—কবিরাও মানুষ, তাদের জীবনও অতৃপ্ত আশা, অলব্ধ ঈপ্সিতের কামনায় ব্যথাতুর হয়। যৌবনে তারা যে মানসীর মূর্ত্তি গড়ে, যার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুকে করে তপস্যা করে,—সে হয়ত চিরদিনই দুর্ল্লভ থেকে যায়। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তার কবিতার উৎস—

বলিয়া অতুল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। সবিতা হাসিতে হাসিতে বলিল,—আর কারু কথা বলতে পারি না, কবি,—কিন্তু আপনার তো এ দুঃখের কারণ নেই! মাধুরীকে পেয়েও কি আপনার মন তৃপ্ত হয় নি!

অতুল কোন উত্তর দিল না, অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সবিতা উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—মাধুরীকে পাওয়া বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ তরুণ কবির পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা,— সে যে সত্যই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—!

অতুল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উদাস কণ্ঠে বলিল,—দেখুন, দেবীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়, এমন কি হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তাঁকে পূজাও করা যায়,—কিন্তু দুর্ব্বল মানুষ ভালবাসতে চায় মানবীকে, তারই মত হাসি ও অশ্রুতে গড়া, আলো ও ছায়ায় বিচিত্র, একটা নারী হৃদয়কে—

সবিতা হাসিতে হাসিতে কহিল,—আপনি কেবল কবি নন, মস্ত বড় একজন দুঃখবাদী দার্শনিক—! এক শ্রেণীর লোক থাকে,—যারা আনন্দের মধ্যে বাস করেও অন্তরে কল্পিত দুঃখলোক সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না, নন্দন কাননে বসেও হা হুতাশ না করলে তাদের মনের তৃপ্তি হয় না। দুঃখ তাদের কাছে একটা বিলাস! মাধুরীর মত ভাল মানুষের হাতে না পড়ে, আপনি যদি অন্য কোন শক্ত মেয়ের পাল্লায় পড়তেন, তবে ঠিক জব্দ হতেন। এ সব হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাসের অবসর সে আপনাকে দিত না—!

অতুল অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। তাহার এই ভাব দেখিয়া মাধুরী সকৌতুকে বলিল,—ভয় নেই, কবি, মাধুরীকে আমি এসব গুপ্তকথা বলে দেব না! কিন্তু সে আজ আপনার সঙ্গে এল-না কেন, বলুন তো! এমনই কি পাকা গিন্নী হয়েছে সে, যে, একটীবারও সময় করে আমার কাছে আসতে পারে না? তাকে বলবেন, আমি তার উপর ভয়ানক রাগ করেছি—

বলিয়া সবিতা কৃত্রিম কোপের ভাব দেখাইল।

অতুল যেন চমকিতভাবে কহিল,—কি সর্ব্বনাশ, কথাটা

আমার মনেই ছিল না! তিনি আসতে পারেন নি বটে, কিন্তু আমাকে তাঁর দূত করে পাঠিয়েছেন—

বলিয়া অতুল জামার ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সবিতার হাতে দিল। কহিল—অসীম মায়াপুর থেকে ওঁকে লিখেছে—!

সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, পত্র হাতে লইয়া তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে সেখানা না খুলিয়াই ম্লান হাসিয়া কহিল,—আপনাদের বন্ধুর পত্র, আমার পড়বার তো অধিকার নেই,—প্রয়োজনও নেই—!

অতুল লঘু পরিহাসের সুরে বলিল,—সে আপনারা দুই সখীতে বোঝাপড়া করুন, আমি দূত অবধ্য, সংবাদ পৌঁছে দিয়েই খালাস—!

সবিতা পত্র হাতে করিয়া নীরব হইয়াই রহিল। একটু পরে অসীমই পুনরায় কহিল,—অসীম আমার বাল্যবন্ধু হলেও, মাধুরীর সঙ্গে তার বেশীদিনের পরিচয় নয়। কিন্তু এরই মধ্যে তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে যাবার আগে দুজনে কত আলোচনা পরামর্শ! আমি অসীমকে ঠাট্টা করে বল্‌লাম, চাণক্য পণ্ডিত কি বলেছেন, জান? রাজনীতিতে কখন নারীর পরামর্শ গ্রহণ করবে না। সুতরাং তুমি বড় ভুল করছো, ওর চেয়ে আমার পরামর্শ যদি নিতে, তোমাকে ঠক্‌তে হত না—!

অসীম শ্লেষের সঙ্গে বলিল, চাণক্য আরও কি বলেছেন, জান! কবি ও পাগলের পরামর্শ কখনই গ্রহণ করবে না!—আমি রাগ করে সেখান থেকে উঠে গেলাম!

সবিতা পূর্ব্ববৎ নীরব হইয়াই রহিল, এসব কথা যে তার কাণে গিয়াছে, এমন কোন ভাবও প্রকাশ করিল না।

অতুল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল,—অনেক বেলা হয়েছে. আজ তবে বিদায়, সবিতা দেবী—!

অতুল চলিয়া গেলেও সবিতা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পত্রখানি হাতে করিয়া নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল। সেখানি খুলিতে যেন তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে কম্পিতকরে পত্র খুলিয়া সবিতা পড়িল,—

"মাধুরী দেবী, মায়াপুরে এসেও আপনার কথা ভুলতে পারছি-নে। এখানে আশ্রমের কাজে, দরিদ্রসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু মন কেবল থেকে থেকে আপনাদের কথাই ভাবছে, অতীতের স্মৃতির সঙ্গে মানুষের এমনই নিবিড় বন্ধন!

কিন্তু অতীতের সুখের কথা ভাববার আমার অধিকার কি? যাদের মধ্যে এসেছি, দুঃখই যে তাদের জীবনের একমাত্র সত্যবস্তু! সে কি অপরিমেয় দুঃখ,—তার কাছে আমার জীবনের সামান্য দুঃখ, নৈরাশ্য, বেদনা কত তুচ্ছ!

এখানকার আশ্রমের কল্পনাটা বড়, কাজ করবার ইচ্ছাও আছে,—কিন্তু বিশেষ কিছুই হয়ে ওঠেনি। আমার সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারি, করবো। এই মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করাই কি একটা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

অতুলকে সঙ্গে করে একদিন এখানে বেড়াতে আসুন না! আমার নিমন্ত্রণ রইল। সেদিন দু-একটী কথাতেই বুঝেছি,

আপনার অনুভূতিশক্তি, সহজজ্ঞান কত তীক্ষ্ণ! নারীর যে মমতার স্পর্শ সব জিনিষকে প্রাণবান করে তোলে, তা আপনার মধ্যে আছে। দেশের কাজে এই জন্যই নারীদের সহযোগিতার প্রয়োজন—!

আপনার স্নেহ ও করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই···

পত্র পড়িয়া সবিতার হৃদয়ে দুঃখ, না, আনন্দ—কি ভাবের উদয় হইল,—তাহা সে নিজেই ভাল বুঝিতে পারিল না। সমস্ত পত্রের মধ্য দিয়া একটা হতাশ ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, গূঢ় অভিমানের তীব্র বেদনা যেন ছাপাইয়া উঠিতেছে। একি পরোক্ষে সবিতার উদ্দেশ্যেই লিখিত—তাহারই উপর এই অভিমান?···

কিন্তু না, এ তাহার মনের কল্পনামাত্র,—পত্রে তো তাহার কথা একটী বার ইঙ্গিতেও বলা হয় নাই! মাধুরীই আজ তাহার বন্ধু, হিতৈষী, পরামর্শদাতা,—সবিতা কেহই নয়—! মাধুরী এ পত্র তাহার নিকট পাঠাইল কেন, তাহার মনে আরো বেশী আঘাত দিবার জন্য?···

একটা সংশয়ের বেদনা কাঁটার মত সবিতার অন্তরে থাকিয়া থাকিয়া বিঁধিতে লাগিল। সে পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

কলিকাতা ফিরিবার পথে সুপ্রভা ও গণপতি দুইজনেই নীরবে গাড়ীতে বসিয়া রহিল। একটা অস্বাভাবিক জড়তা পাষাণভারের মত তাহাদের মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। অবশেষে যখন সুপ্রভার বাড়ীর দরজায় মোটর আসিয়া থামিল, তখন তাহাদের উভয়েরই চমক ভাঙ্গিল,—উভয়েই নিজের অজ্ঞাতসারে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—একবার নেমে ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন কি ?

গণপতির মুখ ক্ষণকালের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল, কুণ্ঠিত ভাবে সে কহিল,—এখন থাক, আর এক সময়ে না হয় আসবো—

বলিয়াই আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গণপতি ড্রাইভারকে মোটর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত করিল। মোটর বেগে ছুটিয়া চলিল।

সুপ্রভা বাহিরের দরজার নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন উঠিতেছিল না। কিসের একটা বাধা তাহার পায়ে যেন অদৃশ্য শৃঙ্খল রচনা করিয়াছিল। অবশেষে নিজেকে সে কতকটা জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

ছোট একটু উঠান, কিন্তু সেইটুক পার হইতেই যেন তাহার কত দীর্ঘ সময় লাগিল। বাড়ী নির্জ্জন নিস্তব্ধ। তাহার আগমনের সম্ভাবনা জানিয়াও, সকলেই কি বাড়ী

ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে? যাক ভালই হইল,—কাহারও সঙ্গে না দেখা হইলেই এখন সে একটু শান্তিতে থাকিতে পারে। সুপ্রভা ধীরে ধীরে ক্লান্তচরণে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু ও কি,—বাড়ীতো একেবারে নির্জ্জন নয়, নীচে তাহার স্বামীর বসিবার ঘরে শব্দ শোনা যাইতেছে! তিনি তবে বাড়ীতেই আছেন! ওই ঘরেই কি সে প্রথমে প্রবেশ করিবে? সুপ্রভা সেই দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ভাবিল না, থাক ··তিনি তো আমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত নন! সে ফিরিয়া নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বিতলে নিজের শয়ন গৃহের দিকে উঠিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন না করিয়াই সে অবসন্নভাবে খাটের উপর শুইয়া পড়িল,—যেন কত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমই তাহার হইয়াছে! কিছুক্ষণ নিঝুম হইয়া সে পড়িয়া থাকিল। সহসা একবার মাথা তুলিয়া সম্মুখের দেয়ালে টাঙ্গানো বড় আয়নার দিকে চাহিতেই সে চমকাইয়া উঠিল। একি, কি হইয়াছে তাহার? চোখ মুখ এমন বসিয়া গিয়াছে কেন, শরীর এত ক্লান্ত অবসন্ন দেখাইতেছে কেন? একি তাহার ক্লান্ত অবসন্ন মনেরই প্রতিচ্ছবি?

কিন্তু তাহার মনে এত দ্বিধা, সঙ্কোচ, কুণ্ঠা কিসের? সে তো কোন অপরাধ করে নাই! তবে কাহার কাছে, সে এমন ভাবে আত্মগোপন করিতে চাহিতেছে? কাল সে গৃহে ফিরে নাই, অন্যত্র রাত্রিবাস করিয়া আসিয়াছে, বটে। এই কি তাহার অপরাধ? কিন্তু এতো সে স্বেচ্ছায় করে

নাই! বাধ্য হইয়াই তাহাকে এরূপ করিতে হইয়াছে! দৈব-দুর্ঘটনার উপর তাহার কোন হাত ছিল না! এর জন্য তাহার দিক হইতে লজ্জা বা সঙ্কোচেরও তো কিছুই নাই। তবে, সে নারী বলিয়াই কি এই অতি তুচ্ছ ঘটনা তাহার পক্ষে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে? তাহার স্বামী, তাহাঁর বন্ধুবান্ধব ইহার জন্য তুলাদণ্ড ধরিয়া তাহার কঠোর বিচার করিবে?···তাই যদি হয়, তবে এ অন্যায় সে কিছুতেই মানিয়া লইবে না,—এত দুর্ব্বল নয় সে! তাহার নারীত্বের সমস্ত শক্তি লইয়া এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। সুপ্রভা মন শক্ত করিয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল।

ঠিক এই সময়ে বিনোদ ধীরে ধীরে নিঃশব্দ গতিতে আসিয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইল। বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত তাহার মুখ গম্ভীর, চক্ষে একটা ক্রূর ঈর্ষার জ্বালা,—বোধ হয়, অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

সুপ্রভা কয়েক মূহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে চাহিয়া চক্ষু নত করিল। তাহার মনে হইল, একটা হিংস্রজন্তু, যেন, আঘাত পাইয়া সহসা তাহার সুপ্তিশয্যা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

গৃহ নিস্তব্ধ, তাহার বাতাস যেন ভারী হইয়া নিঃশ্বাস রোধ করিতে চাহিতেছে, দুইজনের কেহই কথা বলিয়া সেই নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহস পাইতেছে না। অবশেষে বিনোদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে কহিল,—তবু ভাল, বাড়ী ফেরবার কথা মনে পড়েছে। কাল সভায় খুব বক্তৃতা করা হ'ল বুঝি?

সুপ্রভা কোন উত্তর দিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

বিনোদ কহিতে লাগিল,—খবরের কাগজ পড়ে মনে হয়, ওয়াটারলু বা পাণিপথের যুদ্ধই বুঝি-বা একটা হয়ে গেছে। "সহস্র সহস্র লোকের সমাগম,—বিরাট শোভাযাত্রা,—স্বয়ং দেবী রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা,—অগ্নিময়ী বাণী"—আরও কত কি ছাই ভস্ম সব মনেও নাই!···

এই খবরের কাগজ গুলাও তেমনি নির্ল্লজ্জ হুজুগে! যাক্, বাঙ্গলার মেয়েদের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রথম এই অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করলে!

স্বামীর তীক্ষ্ণশ্লেষ উপেক্ষা করিয়া সুপ্রভা যথাসম্ভব শান্ত সহজ স্বরেই কহিল,—যদি সভায় বক্তৃতা করেই থাকি, তাতে কি অগৌরবের কিছু আছে—?

—না, বরং এ আমার পরম গৌরবের কথা! যার স্ত্রী লোকলজ্জা-ভয়, সামাজিক মর্য্যাদা ত্যাগ করে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে পারে, তার জীবন ধন্য!

সুপ্রভার ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইল। তবু ক্রোধ দমন করিয়া শ্লেষের সুরেই কহিল,—আমি যে এমন অবরোধ বন্দিনী কুলবধূ,—আলোবাতাসের সংস্পর্শে যাওয়াই আমার পক্ষে একটা গুরুতর অপরাধ, তাতো জানতুম না! তোমার মুখে স্ত্রী স্বাধীনতার যে সব বক্তৃতা শুনতুম, সে কি তবে কেবল পরস্ত্রীর উপকারের জন্য—!

বিনোদ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—স্বাধীনতার সত্যিকার অর্থ ই যদি তুমি বুঝ্‌বে, তবে আর এ দুর্গতি

হবে কেন? একজনের পক্ষে যা অমৃত, আর একজনের পক্ষে অই হয়ত বিষ—!

—আর কোনটা বিষ, কোনটা অমৃত,—স্বামী দেবতারাই তা ঠিক করে দেবেন, কেমন এই নয়! কিন্তু তোমার এই মতটা স্ত্রীরা হয়ত মেনে নিতে না পারে, কেননা তাদেরও বুদ্ধি বলে' একটা জিনিষ থাকতে পারে—

বলিয়া সুপ্রভা তীব্র দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে চাহিল।

বিনোদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—ও, বুঝেছি—কিন্তু সেই বুদ্ধি খাটিয়ে যে সুনাম কিনে এনেছ, আমাকেই যে চিরজীবন তার ফলভোগ করতে হবে!

সুপ্রভা এই প্রবল আঘাত প্রত্যাশা করে নাই। সে ভাবিয়াছিল, গত রাত্রির আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তাহার নিরুপায় অবস্থার কথা স্বামীকে বলিলে, তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বিনোদের এই তীক্ষ্ণ শ্লেষ, রূঢ় আচরণ সুপ্রভার মনে বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিল। সে তাহার 'কথার কোন উত্তর না দিয়া অবজ্ঞাভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিনোদ কহিতে লাগিল—সভায় বক্তৃতা করা না হয় স্ত্রী-স্বাধীনতার অঙ্গই হল!—কিন্তু বাড়ী ছেড়ে পরপুরুষের সঙ্গে অন্যত্র রাত্রি বাস, এও কি সেই স্বাধীনতারই অঙ্গ—?

সুপ্রভার মুখ আরক্ত হইল, চোখে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় আত্মদমন করিয়া, রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সে নীরব হইয়াই রহিল।

সুপ্রভাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদ আরও উত্তেজিতকণ্ঠে

বলিল,—হয়ত তাই! কিন্তু মূর্খ স্বামীরা যদি এই নূতন স্বাধীনতার মর্ম্ম না বুঝতে পারে, যদি নিজের স্ত্রীকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে তাদের পুরাতন কুসংস্কারে বাধে—

আগ্নেয়গিরির রুদ্ধমুখ এবার খুলিয়া গেল। আহত ফণিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া তীব্রস্বরে সুপ্রভা কহিল,—চুপ কর তুমি! —এমনভাবে আমাকে অপমান করবার অধিকার তোমার নেই—

সুপ্রভার এরূপ অগ্নিমূর্ত্তি বিনোদ কখনও দেখে নাই,—সে বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপরাধিনী যে, তার এত গর্ব্ব, এত তেজ কিসের? আশ্চর্য্য!

সুপ্রভা কহিতে লাগিল,—আমি এমন কোন অপরাধ করিনি, যার জন্য কারু কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—!

বিনোদ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে বলিল,—অপরাধ তোমার নয়, আমার, কেননা আমি তোমার স্বামী—

সুপ্রভা উত্তরে কি একটা শক্ত কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পুরাতন নেপালী ঝি আসিয়া ভাঙ্গা বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করিল—মাইজী, কি রসুই হবে—?

সুপ্রভা তাহার দিকে একবার রোষকষায়িত নয়নে চাহিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল,—কি রসুই হবে, তার আমি কি জানি,—আমাকে বিরক্ত করিস্ নে—যা—!

নেপালী ঝি একবার বিনোদের দিকে, একবার সুপ্রভার দিকে চাহিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বিনোদও নীচে নামিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময়,

স্থুলকায়া মিসেস গুপ্ত সিঁড়ি বাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

বিনোদ সিঁড়ির কাছে আসিয়া শশব্যস্তে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—আসুন, আসুন মিসেস গুপ্ত—

সুপ্রভাও শয্যা হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কোন প্রকারে মিসেস গুপ্তকে একটা নমস্কার করিল।

মিসেস গুপ্ত একজন বারিষ্টারের বিধবা পত্নী। দুইটী অনূঢ়া কন্যা লইয়া ভবানীপুরে থাকেন। 'আধুনিক সমাজের' মেয়েমহলে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি, বিশেষতঃ নবীনারা তাঁর নামে হাড়ে কাঁপে! তিনি কখন কাহার উপর বাম হইয়া তাহার বিরুদ্ধে কি রায় দেন, এই জন্য সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত। পুরুষেরাও নানাকারণে তাঁহাকে একটু ভয় করিয়াই চলেন। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে তাঁহার অবারিত দ্বার।

মিসেস গুপ্ত তাঁহার স্থুলদেহ লইয়া একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে, একটু সুস্থ হইলে, সুপ্রভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এই পথেই—যাচ্ছিলুম, ভাবলুম তোমাকে একবার দেখে যাই। একি, তোমাকে যে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, সুপ্রভা!—তুমি কি এই মাত্র বাড়ীতে ফিরলে?

সুপ্রভার বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে নতমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

মিসেস গুপ্ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কাল তোমার জন্য

আমরা সবাই ভেবে সারা, রেবা-বেলার তো রাত্রে ঘুমই হ'ল না !—তোমার উপর ওদের খুব টান কিনা—

সুপ্রভার মনে হইল, কে যেন তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া পাহাড়ের উপর হইতে নীচে ফেলিয়া দিল ! এই মিসেস গুপ্তের দল এ খবর পাইল কিরূপে ? স্বামীর নিকটে সে নিজের তেজ ও গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, কিন্তু এই মিসেস গুপ্তের ক্রূর দৃষ্টি ও বিষাক্ত রসনার সম্মুখে সে আত্মরক্ষা করিবে কিরূপে ? সুপ্রভা কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার গলার স্বর কে যেন আটকাইয়া ধরিল, সেই সকাল বেলাতেও তাহার কপাল ঘামিতে লাগিল।

মিসেস গুপ্ত পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—শুনলুম মিঃ রুদ্রের সঙ্গে মায়াপুরে না কোথায় গিয়েছিলে, কি একটা সভায় বক্তৃতা করে খুব নামও নাকি কিনেছ ! কিন্তু রাত্রে যে বাড়ী ফিরবে না, এটা তো বাড়ীর লোককে জানাতে হয়—?

কথাগুলির মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা জ্বলন্ত শেলের মত সুপ্রভার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তবু বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া কম্পিত স্বরে সে কহিল,—আসবার মুখে খুব ঝড়বৃষ্টি হ'ল কিনা, গাড়ীও পাওয়া গেল না—

—তাই আসতে পারলে না, কোন একটা হোটেলে বা ডাকবাংলায় রয়ে গেলে। তা সঙ্গে মিঃ রুদ্র ছিলেন, কোন অসুবিধা হয়নি, বোধ হয় !

বলিয়া মিসেস গুপ্ত বক্রদৃষ্টিতে সুপ্রভার দিকে একবার চাহিলেন।

সুপ্রভার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে

লাগিল,—তাহার মনে হইল, সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। একটা চেয়ারের হাতল সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে কোন প্রকারে বসিয়া রহিল।

মিসেস গুপ্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, বিনোদের দিকে চাহিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিলেন,—এখনকার মেয়েরাই সুখী, আমাদের সময়ে এমন স্বাধীনতা আমরা কল্পনা করতেও সাহস পেতাম না—! তা যাক্, বাড়ী ফিরে এসেছে, কোন বিপদ ঘটেনি, —এই ভাল—!

বিনোদ এতক্ষণ দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া কপালের ঘাম মুছিতেছিল। এইবার অতি কষ্টে ম্লান হাসিয়া বলিল,—আমাদের উপর আপনার অসীম স্নেহ, মিসেস গুপ্ত! রেবা-বেলাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন—

সুপ্রভাও মৃদুস্বরে কহিল—রেবা-বেলার সঙ্গে শীগ্‌গীরই একদিন দেখা করতে যাব—

মিসেস গুপ্তের মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নীরসকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—বেশত, কবে দেখা করবার সুবিধা হবে, সে আমি তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। ওরা আবার এরই মধ্যে হাওয়া বদলাতে মধুপুরে যাবে কিনা—! আজ তবে উঠি, মিঃ মিত্র—

মিসেস গুপ্ত সুপ্রভার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

সুপ্রভা ও বিনোদ পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে ক্রোধ, ঈর্ষা, লজ্জা, অপমানের বেদনা,

কোন ভাব যে বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

বাহিরে একটা ছাদের আলিসার কোণে বসিয়া এক কপোতদম্পতী পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালাপ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতর বিনোদ ও সুপ্রভার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, বোধ করি, ভয় পাইয়াই তাহারা উড়িয়া পলাইল। একটা কাক 'কা কা' রবে চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ জানলার ধারে আসিয়া বসিতে লাগিল।

অসীম খুব সকালে উঠিয়া শ্রমিক পল্লীতে চলিয়া যাইত, আর ফিরিত প্রায় বেলা দ্বিপ্রহরের সময়। মজুরদের সঙ্গে সে মিশিত, তাহাদের কাজকর্ম্মের সন্ধান লইত, সুখ দুঃখের কথা শুনিত। তাহাদের ছেলেমেয়েরা কি খায়, কি পরে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিত। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মজুর পাড়ার ছেলেবুড়া সকলেরই সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাকে দেখিলে আর পূর্ব্বের মত সঙ্কোচে সরিয়া যাইত না, কাছে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিয়া নানারূপ আবদার করিত, খেলনা, মিঠাই প্রভৃতির দাবীতে অসীমকে বিব্রত করিয়া তুলিত। অসীমও কিছু কিছু উপহার যোগাইয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিত।

মজুরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া সে ঠিক করিল যে, বস্তীর মধ্যেই একটা নৈশ পাঠশালা খুলিবে এবং নিজেই শিক্ষকতার ভার লইবে। মজুরেরা এই প্রস্তাবে প্রথমে একটু সংশয় প্রকাশ করিলেও, পরে অসীমের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস বশতঃ সম্মত হইল। অসীম সেদিন হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে ফিরিল।

কিন্তু পরদিন প্রভাতে বস্তীতে প্রবেশ করিয়াই অসীম দেখিল, সমস্তই ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মজুরেরা অনেকেই কারখানার কাজে যায় নাই,—স্থানে স্থানে কয়েকজনে দলবদ্ধ হইয়া জটলা করিতেছে। তাহাদের মনের অবস্থা খুবই উত্তেজিত, দুই এক স্থানে তর্কবিতর্ক চরমে উঠিয়া হাতাহাতির

উপক্রম হইতেছে। অসীমকে দেখিয়াই সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অসীম জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা আজ কাজে যাও নি কেন?

উহারই মধ্যে অগ্রণী কয়েকজন উত্তেজিত ভাবে বলিল,—আমরা ধর্ম্মঘট করবো স্থির করেছি!

—ধর্ম্মঘট? হঠাৎ ধর্ম্মঘট করতে যাবে কেন?

একজন যুবক উত্তর দিল,—কলের মালিক আমাদের মজুরী কিছুতেই বাড়াবে না। আমরা দরখাস্ত করে করে হয়রান হয়েছি,—এইবার ধর্ম্মঘট না করলে ওরা শুনবে না—

অসীম চিন্তিত ভাবে বলিল,—ধর্ম্মঘট করা তো সোজা কথা নয়, ভাই। কাজকর্ম্ম বন্ধ করে বসে থাকলে, কারখানা অচল হবে বটে,—কিন্তু তোমরাও মজুরী পাবে না,—তোমাদের ছেলেমেয়েরা সব খাবে কি?

একজন প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী সোৎসাহে বলিল,—সেজন্য ভাবনা নেই, বাবুজী! রুদ্র সাহেব আর মিত্র সাহেব বলেছেন, তাঁরাই সে ভার নেবেন—

অগ্রণী যুবকটী বলিল,—আমরা যে ধর্ম্মঘটের জন্য চাঁদাও দিয়েছি, বাবু—সে টাকা তো আমাদের আছেই—

অসীম একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—রুদ্রসাহেবই কি তোমাদের ধর্ম্মঘট করতে বলেছেন—?

যুবক বলিল,—তিনিই তো আমাদের কর্ত্তা, বাবু,—তাঁর হুকুমেই চলি। তিনি হুকুম দিয়েছেন তোরা ধর্ম্মঘট কর্, কলের মালিক মজুরী বাড়াবার পথ পাবে না—

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আচ্ছা, তোমরা আমার অনুরোধে কয়েকদিন ধর্ম্মঘট বন্ধ রাখতে পার—?

প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী বলিল,—না বাবু, তা হয় না! যে কাজ একবার আরম্ভ করেছি, তার শেষ না দেখে আমরা ছাড়বো না—!

অসীম আর কোন কথা না বলিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে চলিল। মজুরদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেলা যে দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র, পথ আগুণের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।—অসীম ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, শ্রান্ত ক্লান্তভাবে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল।

আশ্রমের দ্বারেই বালিকা শান্তি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। এ কয়দিন প্রত্যহই সে অসীম ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এইভাবে বসিয়া থাকিত। অসীম নিষেধ করিলেও তাহা শুনিত না।

অসীম তিরস্কার করিয়া বলিল,—কি শান্তি, আজও আমার জন্য বসে আছ, এখনও খাওনি—?

শান্তি লজ্জিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না'।

—ছি, এ তোমার বড় অন্যায়! তুমি ছেলেমানুষ এই ভাবে আমার জন্য না খেয়ে বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত বসে থাকবে কেন? আর কখন এমন করতে পারবে না—!

শান্তি কোন উত্তর দিল না, শুধু ভীতা হরিণীর মত তাহার বড় বড় চোখ দুইটী অসীমের মুখের দিকে একবার তুলিয়া আবার নামাইয়া লইল।

অসীম আর কিছু না বলিয়া আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিল। শান্তি তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

ভিতরের বারান্দায় একস্থানে পরিপাটীরূপে মাদুর বিছানো রহিয়াছে, পার্শ্বেই হাতমুখ ধুইবার জন্য পাত্রপূর্ণ জল। অসীম ক্লান্তভাবে মাদুরে বসিয়া পড়িতেই, শান্তি একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অসীম কহিল,—পাখাটা আমাকে দাও, তোমাকে বাতাস করতে হবে না—

শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ বাতাস করিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার এই জিদ দেখিয়া অসীম সস্নেহে হাসিল, তাহার সেবায় বাধা দিতে তাহার মায়া হইল।

অসীম খাইতে বসিলে শান্তি নিকটে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। তখন আশ্রমের সকলেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, দত্ত মহাশয়ের নাসিকা ধ্বনি পাশের ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। কেবল এই বালিকাটি একাকী অভুক্ত অবস্থায় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। অসীম শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিল, চাষার মেয়ে হইলেও তাহার মুখখানি কোমল লাবণ্যমাখা,—কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ অযত্নবিন্যস্তভাবে পিঠে আসিয়া পড়িয়াছে, আয়ত চোখ দুইটী বড় সুন্দর! সংস্কৃত কবিদের কাব্যে যে ঋষিকন্যাদের বর্ণনা আছে, এই বালিকাকে দেখিয়া অসীমের সেই কথাই মনে পড়িল।

খাইতে খাইতে অসীম জিজ্ঞাসা করিল,—শান্তি, আমাকে এমন সেবাযত্ন করতে কে শিখিয়ে দিল,—দত্ত মশায়?

শান্তি তাহার বড় বড় চোখ দুইটী তুলিয়া ভীতভাবে অসীমের দিকে চাহিল, তারপর মাথা নাড়িয়া জানাইল—না!

—তবে, তুমি নিজের থেকেই এইসব করছো?

শান্তি লজ্জিতভাবে মুখ নত করিয়া রহিল।

অসীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কেন আমার জন্য এই সব করছো, বল্‌তে পার—?

শান্তি কোন উত্তর দিল না। কেন যে অসীমের সেবার-জন্য সে এত ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহা নিজেই হয়ত সে জানে না!

একটু থামিয়া অসীম জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মনে কি ইচ্ছা হয়, আমাকে বলতে পার, শান্তি? কি হলে তোমার মন খুব খুসী হয়—?

শান্তি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—জানি না!

—জান না—!—বলিয়া অসীম হাসিয়া ফেলিল।

—তোমাকে ভাল ভাল ছবির বই কিনে দেব, তুমি পড়বে?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—না, সে পড়িবে না।

অসীম বিস্মিতভাবে কহিল,—পড়বে না? সে কি! আমি যদি নিজে তোমাকে পড়াই, তা হলে পড়বে?

শান্তির মুখ এবার প্রসন্ন হইল, সে সঙ্কোচজড়িত মৃদুস্বরে কহিল,—পড়বো!

—বেশ তাই হবে, আমিই তোমাকে পড়াব। কিন্তু সে কলকাতা থেকে ফিরে এসে। আমি কাল কলকাতা যাব—

শান্তির মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। তাহার

হাতের পাখা মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার দুই চক্ষুর শঙ্কা ব্যাকুল দৃষ্টি এই নিবেদনই জানাইতে লাগিল, অসীম যেন কলিকাতায় না যায়—!

অসীম তাহার চোখের ভাষা বুঝিতে পারিল। কহিল,—তোমার কোন ভয় নাই, আমি দু'এক দিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো—

শান্তির মুখের কালিমা অনেকখানি কাটিয়া গেল।

অসীম তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—আচ্ছা শান্তি, আমি যদি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাই, তুমি যাও—?

শান্তির চোখে মুখে যেন আনন্দের বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—সে তখনই যাইতে প্রস্তুত !

অসীম কহিল,—বেশ। এবার নয়, আর একবার নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে কত নূতন নূতন মানুষ, কত নূতন নূতন জিনিষ দেখ্‌তে পাবে !

অসীমের আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল,—এইবার এখানে বসে তুমি খাও—না, না,—এবার তোমার কোন আপত্তি আমি শুনবো না !

শান্তি নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মত অসীমের আদেশ পালন করিতে বসিয়া গেল।

সকালে স্নান সারিয়া মাধুরী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছিল।

এই রন্ধনের কাজটা তাহার কতই না প্রিয় ছিল! দেব-পূজার মতই সে ইহাকে পবিত্র মনে করিত, প্রাণের একান্ত আগ্রহ লইয়া প্রতিদিন এই পূজায় সে প্রবৃত্ত হইত। ধনীর দুলালী সে,—বাল্যকালে এ বিদ্যাটা ভাল করিয়া শিখিবার সুযোগ পায় নাই। তাই দরিদ্র স্বামীর গৃহে আসিয়া প্রথমে সে একটু সঙ্কুচিত হইয়াই থাকিত। যেদিন রন্ধনে কোন ত্রুটী হইত, অতুল না খাইয়া পাতে কিছু ফেলিয়া রাখিত, সেদিন আর মাধুরীর উদ্বেগের অন্ত থাকিত না। আবার যেদিন অতুল তাহার রন্ধনের প্রশংসা করিত, সেদিন মাধুরীর মন খুসীতে ভরিয়া উঠিত, মনে হইত, তাহার সমস্ত পরিশ্রম, সহস্র ত্রুটী, অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে!

শুধু কি রন্ধন? সমস্ত গৃহকার্য্যই তাহার এই দেব-সেবার অঙ্গ ছিল। কত যত্ন করিয়া সে গৃহসজ্জা করিত, কত নিপুণভাবে সে পুষ্পদাম দিয়া স্বামীর বসিবার আসন সাজাইত, তাহার কবি স্বামীর মন যদি এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে একটু প্রফুল্ল হয়! স্বামীর শয্যারচনায় সে নিজের সমস্ত কলানৈপুণ্য প্রয়োগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিত না। নিত্যনূতন ভাবে নিজের বেশভূষার প্রসাধন করিয়া সে তাঁহাকে আনন্দদান করিতে চেষ্টা করিত। স্বামী যে একদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহার মানসীকেই তিনি মাধুরীর মধ্যে লাভ

করিয়াছেন, ইহাই মাধুরীর জীবনের সব চেয়ে বড় গর্ব্ব ও আনন্দ ছিল। সকল দিক দিয়া স্বামীর এই আদর্শের যোগ্য হইবার সে চেষ্টা করিত। দারিদ্র্য ও অভাব তাহাদের নিত্যসঙ্গী ছিল, কিন্তু যে স্পর্শমণি দারিদ্র্যের ধুলিমুষ্টিকেও স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করে, দুঃখ ও অভাবের মধ্যেও স্বর্গরচনা করে,—তাহাই যে তাহার জীবনে শতদল পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল!

কিন্তু আজ আর তাহার জীবনে সে উৎসাহ ও আনন্দ নাই। দীর্ঘকাল সাধনার পর আজ সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে ইষ্টদেবতার পূজা সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া করিয়াছে, আজ বোধ হইতেছে, সে দেবতা তাহার প্রতি বিমুখ, কোন দিনই সে তাহার পূজা বুঝি প্রসন্নমনে গ্রহণ করে নাই। ব্যর্থ—ব্যর্থ—সব ব্যর্থ,—পরিত্যক্ত বিশুষ্ক কুসুমদামের মত তাহার প্রেম আজ উপেক্ষিত, ধূলায় লুণ্ঠিত! তাহার দেবতা আজ কোন মায়ামরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান—!

অন্যমনা হইয়া এই সব চিন্তা করিতে রন্ধনের কথা মাধুরী ভুলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং চুলীর উপর চাপানো ব্যঞ্জনটা যে কখন 'ধরিয়া' গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

—একি মাধুরী দেবী, আপনার রান্নার যে চমৎকার সুগন্ধ বেরিয়েছে—বলিতে বলিতে অসীম আসিয়া রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে হাসিমুখে দাঁড়াইল।

কণ্ঠস্বরে মাধুরীর চমক ভাঙ্গিল এবং অসীমের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার মুখ যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। সাগ্রহে কহিল,—আসুন, আসুন, অসীম বাবু,—কবে কলকাতায় এলেন—?

পরক্ষণেই চুলীর দিকে দৃষ্টি পড়িতে সে বিষম লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি ব্যঞ্জনের কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া কহিল,—আঃ, আমার কপাল—এ যে একেবারে পুড়ে গিয়েছে! কি যে ছাই মন—

বলিয়া মাধুরী অপ্রতিভ ভাবে হাসিল।

অসীমও হাসিয়া বলিল,—আপনাকে খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছি, নয়—? কিন্তু আমিও কম আশ্চর্য্য হইনি! এমন মুখ অন্ধকার করে কি ভাবছেন, রান্নাটা যে একেবারে পুড়ে গিয়েছে, তারও খেয়াল নেই। কি হয়েছে বলুন তো, অতুল কোথায়?

মাধুরী ম্লান হাসিয়া কহিল,—আপনার এতগুলি প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া তো সম্ভব নয়। উপরে বসবেন চলুন—

বলিয়া মাধুরী বাহিরে আসিয়া রান্নাঘরের দরজায় শিকল লাগাইয়া দিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে অসীম বলিল,—অসময়ে এসে আপনাকে খুবই বিব্রত করেছি, নয়—? এখনও আপনার রান্না শেষ হয়নি—

নিজের হাতে বোনা একখানি আসন অসীমের জন্য সযত্নে মেজেতে পাতিয়া দিয়া, মাধুরী বলিল,—বসুন, বন্ধুর বাড়ীতে এসে এত সঙ্কোচ করতে নাই! আর কী-ই বা ছাই আমার রান্না, কখন হয়ে গেছে—!

বলিয়া মাধুরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

অসীম কয়েক মুহূর্ত্ত একদৃষ্টে মাধুরীর দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বিশুষ্ক কমলদলের মতই সে প্রফুল্লমুখ আজ ম্লান, চোখের কোণে কালো রেখা পড়িয়াছে, দেহের সে অপরূপ মাধুরী অস্তগামী চন্দ্রের মত নিষ্প্রভ! কয়েক দিন পূর্ব্বেই যে হাস্যময়ী আনন্দরূপিণী নারীকে সে দেখিয়াছিল, এ যেন তাহার ছায়ামাত্র! এই কয় দিনের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল, তাহাই ভাবিয়া অসীম নিজের অন্তরে একটা গভীর বেদনা অনুভব করিল।

মাধুরী অসীমের ভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল। কথা গুলি অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই, তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ছি ছি! অসীম বাবু না জানি কি মনে করিয়াছেন! নিজের ত্রুটী সংশোধন করিবার জন্য সে জোর করিয়া মুখে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,—

—একি! আপনি যে একেবারে বিষম চিন্তায় পড়ে গেলেন! কিছুই হয়নি আমার,—সংসারে থাকতে গেলে ছোটখাট সুখদুঃখ তো আছেই, তাই মানুষের মন সব সময়ে সমান থাকে না—

অসীম অভিমানের স্বরে কহিল,—আপনার ও সব ফাঁকা কথায় আমি ভুলবো না। আমাকে যখন বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন, তখন বলতেই হবে আপনার কি দুঃখ! সেদিন আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাতে বিশ্বসংসারের সব কথাই ছিল,—ছিল না কেবল আপনার অন্তরের দুঃখের লেশমাত্র আভাস!

মাধুরী করুণভাবে হাসিল, সে হাসি বুঝি অশ্রুরই রূপান্তর!

বিষাদখিন্ন কণ্ঠে কহিল,—পত্রে দুঃখের কাহিনী গেঁথে গেঁথে কাব্যরচনা করে লাভ কি? সত্যিকার যে দুঃখ, সে তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, বন্ধু—!

অসীম কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিয়া বলিল,—মাধুরী দেবী, বন্ধুত্বের দাবীতে যদি কিছু অনধিকার চর্চ্চা করে ফেলি, ক্ষমা করবেন। অতুল কি আপনাকে পূর্ব্বের মত ভালবাসে না, তেমন যত্ন করে না? আমাকে সত্যি করে বলুন—

মাধুরী ম্লান হাসিয়া বলিল,—সত্যি বলছি, আমার জন্য যত্নের তাঁর কোন ক্রটী নেই, যাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! বরং মনে হয়, আমাকে একটু খুসী করবার জন্য, পূর্ব্বের চেয়ে তিনি আরও বেশী ব্যগ্র। কিন্তু বন্ধু, মন্দির থেকে যখন দেবতা অন্তর্দ্ধান করেন, তখন বাহিরে যতই পূজার আড়ম্বর হোক না কেন, সবই যে মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়—!

অসীম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন আপন মনেই কহিল,—মূর্খ নির্ব্বোধ সে, নইলে এমন রত্ন পেয়েও সে তার মূল্য বুঝতে পারল না! যতই কাব্য রচনা করুক, তার হৃদয়ের দ্বার এখনও রুদ্ধ—!

মাধুরী অসীমের নিকটে সরিয়া আসিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিল,—এত উত্তেজিত হতে নাই, বন্ধু! জোর করে কি কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে? দোষ তার নয়, দোষ আমার! আমিই হয়ত তার সুপ্ত হৃদয়ের সবখানি জাগিয়ে তুলতে পারিনি,—আমা মধ্যে তার মন সম্পূর্ণ তৃপ্তি পায়নি!

একটু থামিয়া ব্যথাভরা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল,—

অথচ একদিন আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে তাকেই আমি ভালবেসে-ছিলুম,—সর্ব্বস্ব তার জন্য উৎসর্গ করেছিলুম। এখন বুঝেছি, তাকে সুখী করবার শক্তি আমার নেই। সবিতার মত কোন বিদূষী মেয়ে হলে হয়ত পারত—!

বলিয়া মাধুরী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল।

অসীম সহসা চমকিত ভাবে মুখ তুলিয়া মাধুরীর দিকে চাহিল ;—তাহার চোখে মুখে বিস্ময় ও বেদনা মিশ্রিত যে ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহা মাধুরীর দৃষ্টি এড়াইল না। নিজের অজ্ঞাত-সারেই অসীমের গভীর ক্ষতস্থানে সে আঘাত করিয়াছে, এই ভাবিয়া মনে মনে সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল।

অসীমের মুখের দিকে চাহিয়া, ম্লান হাসিয়া সে কহিল,—সবিতার মনের উপর কেবল একজনেরই অধিকার আছে, চিরদিনই তাই থাকবে—

অসীমের মুখে গভীর বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল,—প্রায় আর্ত্তনাদের স্বরে সে কহিল,—মাধুরী, তুমিও কি আমাকে এমনি ভাবে আঘাত করবে। যা একজনের কাছে রহস্য, আর একজনের কাছে তাই যে তীব্র জ্বালাময় স্মৃতিতে ভরা, একি তুমি জান না—!

মাধুরী গাঢ় স্বরে বলিল,—জানি বন্ধু, কিন্তু এও জানি. সে তোমাকে কত ভাল বাসে! নারীর কাছে নারীর হৃদয় তো বেশীক্ষণ লুকানো থাকে না! তুমি নিজের মনে একটা মিথ্যা সংশয় সৃষ্টি করে কষ্ট পাচ্ছ, বন্ধু—

অসীম অধীর কণ্ঠে বলিল,—না—না, মাধুরী,—আমি কাউকে ভালবাসিনি,—কারু ভালবাসা চাইনি!—তুমি আমার কাছে,

কোন রূপ কথার রাজকন্যার কাহিনী বলে আমার মন প্রলুব্ধ করতে বৃথা চেষ্টা করো না—!

মাধুরী স্নিগ্ধ মধুর হাসিল, সে হাসিতে মাতার কোমল স্নেহ এবং ভগিনীর অনাবিল প্রীতি যেন যুগপৎ প্রকাশ পাইল। কহিল, —আমাকে প্রলুব্ধ করতে হবে না,—তার যদি সত্যিকার ভালবাসা থাকে, তবে একদিন সে তোমাকে জয় করবেই—!

অসীম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কল্পনা থাক, মাধুরী দেবী,—সত্যিকার জীবনের সংস্পর্শে এসে দেখছি, মানুষের দুঃখ কত গভীর, সীমাহীন! আমিও সেই দুঃখীদেরই একজন হতে চাই, তাদের ব্যথা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে চাই. তাদের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে চাই—!

—কিন্তু এই গভীর দুঃখ কি তুমি একাই ভোগ করতে চাও, বন্ধু? এ তোমার ঘোর স্বার্থপরতা। আর কেউ কি তোমার দুঃখের ভাগ নিতে পারে না? আমি জানি, সবিতার জীবনে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আর কিছু নেই,—তোমাকে দুঃখের মধ্য দিয়েই সে পেতে চায়;—তোমার পথের বাধা নয়, সঙ্গিনী হওয়াই তার অন্তরের কামনা—!

অসীম ম্লান হাসিয়া বলিল,—সমাজ পুরুত ডেকে, মন্ত্র পড়ে একটা ছাপ দিয়ে দিলেই কি দুজনের জীবন এক হয়ে যায়,—প্রাণের যোগ, হৃদয়ের যোগ ঘটে? তুমিও এমন ভুল কথা বলো না, বন্ধু!—আর যাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন নেই, তাদের মধ্যে কি মনের মিল, আদর্শের মিল হতে পারে না?

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল,—আমি অনেকদিন থেকে এই

কথাটাই ভেবেছি। যারা স্বামী স্ত্রী নয়, ভাই বোন নয়—তাদের বন্ধুত্ব সমাজ এত হেয় মনে করে কেন, এত সংশয় সন্দেহ জাগে কেন, কুৎসা গ্লানি এমন শতমুখী হয়ে ওঠে কেন? দুই নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর মধ্যে কি নির্ম্মল বন্ধুত্ব হতে পারে না, দেহের সম্বন্ধের অতীত মনের সম্বন্ধ কি কল্পনায় আসে না?

মাধুরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—এ বড় কঠিন সমস্যা বন্ধু! তুমি ঠিক কথাই বলেছ, কিন্তু সংস্কারের বন্ধন সহজে কাটা যায় না,—আর সে বন্ধন সব সময়েই যে মানুষের অকল্যাণ করে, এমন কথাও তো বলতে পারি না—।

মাধুরীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অসীম বলিল,—ভুল বুঝো না, মাধুরী! আমার ইচ্ছা হয়, তোমাকে আমি আমার দুঃখের অংশ দিই, আমার কল্পনা, আমার আদর্শ তোমাকে জানাই,—নারী হলেও তুমি আমার যথার্থ বন্ধু;—নারী বলেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যদি লোক সংশয়ের চোখে দেখে, তবে তার ভয়ে আমি বিচলিত হব না—

মাধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহজ শান্ত স্বরেই বলিল,—আমার এ অশেষ সম্মান, বন্ধু! এত সম্মান কেউ কোনদিন আমাকে দেয় নি!···কিন্তু···এ গ্রহণ করবার যোগ্যতা তো আজ আমার নেই!—যদি কোন দিন—

বলিতে বলিতে মাধুরী অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন, যতদূর দৃষ্টি চলে, নীলাকাশে একখণ্ডও মেঘ নাই। সেই সীমাহীন নীলাকাশের দিকে চাহিয়া অসীম ও মাধুরী উভয়েই অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অসীম আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—আজ তবে বিদায় বন্ধু! এমন দিন হয়ত আসবে, যেদিন তুমি আমার বন্ধুত্বের দাবী এমন করে' অগ্রাহ্য করতে পারবে না। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষাতেই আমি থাকবো—

মাধুরীর চোখ ছল ছল করিতে লাগিল,—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল—এ তোমার অন্যায় অভিমান, বন্ধু,—আমি কোনদিনই সে দাবী অগ্রাহ্য করি নি—

—বাবা, তুমি তো আজ আর কোথাও যাবে না—?"

কন্যার প্রশ্নের উত্তরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধাজড়িত স্বরে গণপতি কহিলেন—তা গেলেও হয়, একটা কাজ ছিল বটে !

সবিতা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—না, না,—আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই ! এই কয়দিনের খাটুনীতে তোমার শরীর যা হয়েছে, একটু বিশ্রাম না করলে চলবে না—!

শরীরের জন্য গণপতি তেমন ব্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার মন বন্দীর ন্যায় ছটফট করিতেছিল। মায়াপুর হইতে ফিরিবার পর হইতে সুপ্রভার সঙ্গে আর তাঁহার দেখা হয় নাই, পূর্ব্বের অভ্যাস মত তাহার গৃহে সান্ধ্যবৈঠকে যোগ দিতেও তিনি যান নাই। এ যে কেবল শারীরিক ক্লান্তির জন্য বা সবিতার অনুরোধে তা নয়, তাঁহার নিজের মনের মধ্যেই কিসের যেন একটা বাধা তিনি অনুভব করিতেছিলেন। একটা লজ্জা বা সঙ্কোচ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছিল। সেই মায়াপুরের ঘটনা, সেই দুর্যোগময় রাত্রির স্মৃতি, থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিতেছিল এবং দিনের পর দিন কল্পনায় তাহা আরও বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল। ওঃ, সুপ্রভা না জানি তাঁহাকে কত হীন মনে করিয়াছে, এর পর তাঁহার সঙ্গে মিশিতে বা কথা বলিতেও সে হয়ত ঘৃণা করিবে! তাঁহার শিক্ষা সভ্যতা, দেশপ্রেমের গর্ব্ব,.

নেতৃত্বের গর্ব্বে ধিক ! আর বিনোদ !—বিনোদ এতদিনে সুপ্রভার নিকটে সব কথাই শুনিয়াছে ! নিশ্চয়ই সে তাঁহাকে বিশ্বাস-ঘাতক, বন্ধুদ্রোহী, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানহীন বলিয়া স্থির করিয়াছে। বিনোদ হয়ত তাঁহাকে স্বগৃহে প্রবেশ করিতে দিতেও আপত্তি করিবে ? যে বিনোদ সেদিনও তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল, আজ তাহার নিকটেই তাঁহাকে এত ছোট হইতে হইবে !

তারপর, এই কথা যে কেবল বিনোদ ও সুপ্রভাই জানে তাহা নহে, নিশ্চয়ই ইহা তাহাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সকলে না জানি গণপতিকে কী ভাবিতেছে !

কিন্তু সুপ্রভাকে না দেখিয়াও তাঁহার পক্ষে বেশী দিন ধৈর্য্য ধারণ করা অসম্ভব ! বরং যতই ভিতর ও বাহিরের এই সব বাধা প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল, ততই সুপ্রভাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল ! বর্ষার স্রোতস্বিনীর মুখে বাঁধ দিলে, তাহার বারিরাশি যেমন আরও প্রবল বেগে গর্জ্জিয়া ফুলিয়া উঠে, গণপতির মনের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সুপ্রভার রহস্যময় মৃদুহাস্য, কালো চোখের গভীর দৃষ্টি, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী, মধুর কণ্ঠস্বর, গণপতির সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যেন সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

আজও এমনিতর দ্বন্দ্ব গণপতির মনের মধ্যে চলিতেছিল। গণপতির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় হইয়াছিল, সবিতার জন্য। সবিতার মনে যদি কোন সন্দেহ জাগে, তাঁহার পাপ মনের চিন্তা যদি আভাসেও তাহার নিকট ধরা পড়ে, তবে তো

তিনি আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না। কন্যার সরল স্নেহময় দৃষ্টির সম্মুখে তিনি তাঁহার কলুষিত হৃদয় লইয়া দাঁড়াইবেন কিরূপে? পাছে সেই দুর্যোগ রজনীর কথা সুপ্রভা কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ে তিনি যথাসাধ্য সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিতেন। কিন্তু গণপতির সৌভাগ্যক্রমে সেদিনকার কোন কথা, এমন কি সভায় সুপ্রভার অদ্ভুত বক্তৃতার কথাও সবিতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহার এই ঔদাসীন্যও গণপতির চিত্তকে পীড়িত করিতেছিল। সবিতা এমন নীরব কেন, তাহার মনে কি একটুও কৌতুহল হয় নাই অথবা তাহার মনে কোন সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছে—?

পিতার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সবিতা কহিল,—আজ আবার ডাঃ ঘোষকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিলুম, বাবা! তিনি বললেন, তোমার বাবাকে খুব সাবধানে রাখবে, তাঁর কিছু-দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার,—ওষুধটাও খেতে হবে—

গণপতি ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—এরই মধ্যে আবার ডাঃ ঘোষকে ডেকেছিলি,—পাগলী মেয়ে কোথাকার! আমার কিছুই হয়নি,—শুধু একটু স্নায়বিক ক্লান্তি। তা দুদিনেই সেরে যাবে—

সবিতা বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল,—না,—না,—ও সব কথা আমি শুনতে চাইনে! ডাঃ ঘোষ যা বলছেন, তা তোমাকে করতেই হবে। আমি কোথাও তোমাকে যেতে দেব না, তোমার ওষুধপথ্য সব আমি নিজে ঠিক করে দেব—!

কন্যার এই ভাব দেখিয়া গণপতি হাসিয়া ফেলিলেন;—বলিলেন,—কিন্তু যে সব কাজের ভার নিয়েছি, তাও তো

করতে হবে! এই দেখ, লাহোর থেকে "নিখিল ভারত হরকরা সমিতির" সেক্রেটারী চিঠি লিখেছে,—বড় দিনের ছুটীতে গিয়ে তাদের একটা সভায় সভাপতি হতে হবে। বক্তৃতাটা কয়েকদিন আগেই লিখে পাঠানো চাই, ছাপাবার জন্য—

সবিতা সভয়ে বলিল,—এই শীতের মধ্যে তুমি যাবে লাহোরে,—তা হ'লেই হয়েছে! বিলাতের মত সেখানেও ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে যায়,—তুমি সে শীত সহ্য করতে পারবে না, বাবা! তাদের আজই চিঠি লিখে দাও, তোমার যাওয়া হবে না—

গণপতি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—ভেবে দেখ্, কত বড় গৌরবের কথা, পাঞ্জাব থেকে আমাকে সভাপতি হবার জন্য আহ্বান করেছে। এ আহ্বানে যদি আমি সাড়া না দিই, তবে যে কেবল আমায় লজ্জিত হতে হবে, তা নয়,—বাঙ্গলারও দুর্ণাম হবে—!

—কিন্তু তোমার শরীর টিকলে তবে তো বাঙ্গলার সুনাম রক্ষা করবে—!

গণপতি একথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা এক সময়ে বলিলেন,—আচ্ছা বিশ্বপতিকে না ডেকে, আমাকেই তারা ডাকল কেন, বল্ তো! তার নেতা হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, আমাকে কোন রকমে সরিয়ে দিয়ে সেই স্থান দখল করবার চেষ্টা! কিন্তু দুঃখ এই, সে নিজেকে মস্ত একজন নেতা ভাবলেও, লোকে তা ভাবে না—

বলিয়া গণপতি প্রসন্নমনে হাসিতে লাগিলেন। সবিতা নীরব হইয়া রহিল, তাহার মুখে সুস্পষ্ট বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

গণপতি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন,—বিশ্বপতি আর অসীম তুজনে মিলে কি কাণ্ড করেছে, জানিস? মায়াপুরে গিয়ে মজুরদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এমন কি, লোক ভাঙ্গানোর জন্য, সেখানে কি একটা আশ্রমও খুলে বসেছে—! আমি জানি, বিশ্বপতি চিরকালই ভণ্ড, কিন্তু অসীম যে এমন অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন তা ভাবিনি—

পিতার কথা শুনিতে শুনিতে সবিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। —একি সত্য? না না, সত্য নয়, হয়ত পিতারই ভুল হইয়াছে—! —সবিতার মন এই চিন্তাতে সংশয়ের দোলায় তুলিতে লাগিল।

গণপতি সবিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া আরও উত্তেজিত স্বরে কহিলেন,—কিন্তু আমি সহজে ওদের ছাড়বো না, এর প্রতিশোধ নিতে আমি জানি! বিশ্বপতির বোধ হয় মনে নাই, দেনার দায়ে ওর ভদ্রাসন আমার কাছে বাঁধা! বাল্যবন্ধু বিপদে পড়ে' ঋণ নিয়েছিল,—মনে করেছিলাম, টাকাটা আর নেব না। কিন্তু আর নয়,—এ অকৃতজ্ঞতার শাস্তি আমাকে দিতেই হবে! যে দিন বিশ্বপতির বাড়ী নীলামে চড়াবো,—সে আর অসীম রাজপথে গিয়ে দাঁড়াবে, সেই দিনই আমার মন তৃপ্ত হবে—!

সবিতা উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল,—তুমি এ সব কি বল্‌ছ, বাবা? তুচ্ছ দলাদলির জন্য তুমি এইভাবে বাল্যবন্ধুর সর্ব্বনাশ করবে?

—তুই এটাকে তুচ্ছ মনে করিস্‌, সবিতা? আমার জীবনের সবচেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য, বড় আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেবার জন্য ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করবে,—আর আমি নীরবে দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বো, কোন প্রতিশোধ নেব না,—এত বড় যীশুখৃষ্ট আমি হইনি—!

—কিন্তু বাবা, বিশ্বপতি কাকা তো তোমার বহু উপকার করেছেন। শুনেছি, একবার তাঁরই সেবার গুণে, তুমি সাক্ষাৎ যমের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছিলে—

গণপতির মুখে মুহূর্ত্তকালের জন্য একটা ম্লানছায়া পড়িল। পরক্ষণেই দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলিলেন,—সে সব কবে কি করেছিল, শোধবোধ হয়ে গেছে। আজ সে যখন আমার শত্রু, তাকে কিছুতেই ক্ষমা নাই। শুধু গৃহছাড়া নয়, দেশ ছাড়াও ওদের করবো, এই আমার পণ—!

সবিতা গভীর বেদনাহত দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতার চক্ষুর অস্বাভাবিক দীপ্তিতে, বক্র অধর-কোণে, কুঞ্চিত ভ্রূযুগে, যে ক্রূরতার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। উদার-হৃদয়, বন্ধু-বৎসল পিতার আজ একি ভাবান্তর!

কন্যার সেই বেদনাহত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিতেই গণপতি অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, বোধ হয় সে দৃষ্টি তিনি সহ্য করিতে

পারিলেন না।···পিতাপুত্রী দুইজনেই নীরব, সেই গৃহের বায়ু তাঁহাদের মনের সংশয় ও বেদনার চাপে যেন ভারী হইয়া উঠিল।

এমন সময় অতুল ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু গণপতিকে দেখিয়াই দ্বারদেশে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর নমস্কার করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"মিঃ রুদ্র!"

অতুলকে দেখিয়া গণপতি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি একটু অতিরিক্ত উল্লাসের সঙ্গেই বলিলেন—অতুল বাবু যে,—এস—এস! প্রায়ই মনে করি, মাধুরী আর তোমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করে' পাঠাবো,—কাব্যালোচনা, বনভোজন এই সব হবে। কিন্তু এত কাজের ভীড় যে নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই—!

বলিয়া গণপতি চকিতে একবার সবিতার দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহার মুখে কোন ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না।

—তোমার যে নূতন "লাঙলের গান" বেরিয়েছে, তা আমাদের মজুরদের শিখিয়ে দিয়েছি। কি চমৎকার গান,—গাইতে গাইতে ওরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কি সুন্দর তোমার ভাষা আর উপমা! সমাজের এই যে দরিদ্র, অশিক্ষিত, নির্য্যাতিত, নিষ্পেষিতের দল,—লাঙল এদেরই প্রতীক,—এরাই দিনরাত খেটে ধন উৎপাদন করছে,—তার ফলে ধনীর ধন ক্রমেই স্তূপাকার হয়ে উঠছে, কিন্তু ওদের কেবল পরিশ্রমই সার—!

অতুল নিজের কবিতার প্রশংসায় প্রীত হইয়া সলজ্জভাবে হাসিতে লাগিল।

গণপতি তাহা লক্ষ্য করিয়া অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন,—সেদিন মায়াপুরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তাতে তোমার গানের এই ভাবটাই আমি গ্রহণ করেছিলাম,—লোকে শুনে ভারি খুসী—

সবিতা কহিল,—বসুন, অতুল বাবু,—দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে নিজের কবিতার প্রশংসা শোনার চেয়ে স্থির হয়ে বসে শোনাই ভাল নয় কি ?

অতুল একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া গদগদ স্বরে বলিল,—কবি অন্যকে আনন্দ দেবার জন্যই কবিতা লেখে। আমার লেখনী সার্থক যে, এ কবিতা আপনার এত ভাল লেগেছে। সবিতা দেবী, আপনি ও গানটা শুনেছেন কি ?

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিল,—বাবাকে আমিই এই গানটা গেয়ে শুনিয়েছি ! আমার কিন্তু মনে হয়, ওর মধ্যে অনেকখানিই কষ্টকল্পনা, তেমন সহজ স-লীল গতিভঙ্গী নেই—যেন কবি যা লিখেছেন, নিজের অন্তরে তা অনুভব করতে পারেন নি—

অতুলের মুখ পবনতাড়িত নির্ব্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

গণপতি তাহার দুরবস্থা দেখিয়া হাসিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন,—তুমি ওর কথা শুনো না, অতুল! এখন তোমাকে ক্ষেপানোর জন্য এই সব বলছে। অথচ সেদিন আমার কাছেই তোমার নূতন গানের কত প্রশংসা করল—

অতুলের মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বুকে সাহস আসিল। পিতার কথা শুনিয়া সবিতা অন্যদিকে চাহিয়া মুখ

টিপিয়া হাসিতে লাগিল। একটু পরে অতুলের দিকে ফিরিয়া বলিল,—এত সহজেই আপনি মুষড়ে যান কেন! কবি! কবি লিখ্‌বেন, আপনার মনের প্রেরণায়, লোকের নিন্দাস্তুতি গ্রাহ্য করবার তাঁর দরকার কি?

অতুল কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল,—এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি সুন্দর নীলাভ চৌকা লেপাফা গণপতির হাতে দিল।

গণপতি খামের উপরের লেখা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দ্রুতকম্পিত হস্তে খামখানি খুলিয়া ফেলিলেন, পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হৃৎপিণ্ড জোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সুপ্রভা লিখিয়াছে, গণপতির সঙ্গে তার আজই দেখা করা চাই, বিশেষ প্রয়োজন! কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই যে দ্বিধা ও সংশয়ে গণপতির চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল, পত্র পড়িয়াই তাহা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই সুপ্রভার নিকটে যাইবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।···এ কয়দিন না যাওয়াটা খুবই অন্যায় হইয়াছে! তাঁহার মনে যে সব সংশয় ও আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোনই ভিত্তি নাই,—সুপ্রভা তাঁহার উপর কিছুমাত্র বিরক্ত হয় নাই!

ভৃত্য আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। গণপতি ব্যস্ত ভাবে তাহাকে বলিলেন,—শীগগীর মোটর বের করতে বল—

সবিতা এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত ভাবে পিতার ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কার চিঠি বাবা, কোথায় যাবে তুমি?

সবিতার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে পলকের জন্য চাহিয়া, অন্য দিকে ফিরিয়া গণপতি অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—বিশেষ একটা জরুরী কাজে যেতে হবে—

কন্যার নিকটে এই অর্দ্ধসত্য বলিতে গণপতির মুখ লজ্জায় লাল হইল, কপাল ঘামিয়া উঠিল। দ্রুতপদে বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে তিনি কহিলেন,—এখনি আমি ফিরে আসছি,—তুই ততক্ষণ অতুলের সঙ্গে কথা বল—!

গণপতি চলিয়া গেলে সবিতা বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। অতুল যে সেই ঘরেই বসিয়াছিল, ইহা সে যেন ভুলিয়াই গেল। সহসা এক সময়ে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিল,—

—অতুল বাবু এখন বাড়ী ফিরবেন তো! চলুন না, আমাকে বিশ্বপতি কাকার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবেন—!

অতুল মনে মনে এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু বাহিরে, সবিতার এই কাজটুকু করিবার সুযোগ পাইয়া সে যেন কৃতার্থ হইয়াছে, এমনি ভাব দেখাইয়া বলিল,—বেশতো, চলুন—!

বিশ্বপতি নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন বটে,—কিন্তু তাঁর কতকগুলি খেয়াল ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় পরিতেন, জুতার বদলে খড়ম পায়ে দিতেন, জেলের কয়েদীদের মত ছোট ছোট করিয়া চুল ছাঁটিতেন। গণপতি একবার বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওহে বিশ্বপতি, —সামনের গোটাকয়েক দাঁতও তুলে ফেল না কেন? তাহলেই পুরাদস্তুর মহাত্মা হতে পারবে—! বিশ্বপতি শুধু একটু হাসিয়াছিলেন, কোন উত্তর দেন নাই।

আহার সম্বন্ধেও তিনি কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সকালবেলা কিছু দুধ বা ফল এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে হবিষ্যান্ন —এই ছিল তাঁহার আহারের বরাদ্দ। গরুর দুধের পরিবর্ত্তে ছাগলের দুধ চালাইবার চেষ্টাও দুই একবার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহিণী প্রস্তাবটি শুনিয়া এমন রণচণ্ডীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন যে, বিশ্বপতি আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই।

আজও তেমনই একটা কুরুক্ষেত্রকাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। বিশ্বপতি সকালে উঠিয়া গৃহিণীকে জানাইলেন যে, সেদিন তিনি শুধু যবের ছাতু ও কাঁচা কলমীর শাক খাইয়া থাকিবেন, আর কিছু খাইবেন না। শুনিয়া গৃহিণী কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন,—দেখ, ওসব চলবে না,—তুমি পাগল হয়েছ বলেই তো আর আমি হই নি—

বিশ্বপতি ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—ও-দুটো জিনিষেই প্রচুর 'ভাইটামিন' আছে, ডাক্তারদের এই মত। মহাত্মাজী বলেছেন,—

গৃহিণী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—মহাত্মাজী যাই বলুন, তা আমার শোনবার দরকার নেই। তুমি একেবারে মহাত্মা হয়ে উঠেছ কিনা—! না খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে কঙ্কালসার করেছ, তার উপর কাঁচা শাক ও ছাতু খেয়ে আমাশা হোক, আর আমি ভুগে মরি! আর দশটা দাসী বাঁদী তোমার নেই যে—

এমন সময় অসীম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণীর ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া অসীমকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—একজন ছন্নছাড়া ভবঘুরে, আর একজন পাগল,—দুই-ই সমান! বেশ তোমরা দুই কাকা-ভাইপোতেই সংসার কর, আমি চললুম! ভাইয়েরা গরীব হলেও একটা বোনকে খেতে দিতে পারবে—!

বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন।

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিলেন, তারপর, অপরাধটা যেন তাঁহারই, এইভাবে কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন,—ওঁদের কোন দোষ নেই, অসীম! উনি চান আমি কিসে একটু ভাল থাকি, আমার কোন কষ্ট না হয়;—তার বেশী উনি চিন্তা করতে পারেন না। কিন্তু আমি যে দেশের লক্ষ লক্ষ অনাহার-ক্লিষ্ট অর্দ্ধ-উলঙ্গ, নরনারীকে চোখের সামনে দেখ্‌ছি,—আমি কি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে পারি! তুমিওতো স্বচক্ষেই গরিব শ্রমিকদের

অবস্থা দেখছ, তুমিই বল অসীম, আমাদের কি নিজের সুখ ভোগ করবার অধিকার আছে ?

অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—ঠিক কথা কাকাবাবু! কিন্তু—

—'কিন্তু' আমি শুনতে চাই না। আমি জানি, তুমি বলবে, পৃথিবীর কতকগুলি লোক দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করছে বলে যে, সকলেরই স্বেচ্ছায় তাই করতে হবে, তার কোন অর্থ নাই। সে কথা হয়তঃ কিছু সত্য। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় এই দরিদ্রের সেবাব্রত গ্রহণ করছে, যারা তাদের মর্ম্মব্যথা বোঝে, তাদের তো জবাব দেবার কিছু নেই—!

অসীম কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নীরব হইয়াই রহিল। একটু পরে বিশ্বপতি পুনরায় কহিলেন,— —এরা আজ নিদ্রিত, এদের মনুষ্যত্ব মোহাচ্ছন্ন !— কিন্তু যেদিন অকস্মাৎ এরা জেগে উঠবে, সেদিন এদের রুদ্রতাণ্ডব সমাজ সহ্য করতে পারবে না, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—

অসীম কহিল,—সেদিন খুব দূরে নয়, কাকাবাবু। আপনাকে সেই কথাই আজ আমি জানাতে এসেছি। মায়াপুরের শ্রমিকদের মধ্যে কিছুদিন হল খুবই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, গণপতি বাবু সেই ধূমায়িত বহ্নিতে ফুৎকার দিয়ে এসেছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই সেখানে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হবে—

—ধর্ম্মঘট ?—বল কি অসীম! সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত অনিবার্য্য,—আর তার ফলে আসবে—

আরও বেশী দারিদ্র্য, অনাহার, দুঃখদুর্দ্দশা—! কিন্তু তা সহ্য করবার ক্ষমতা এখনও ওদের জন্মেনি! তুমি ওদের বুঝিয়ে বলতে পার না অসীম,—কত বড় ভুল ওরা করছে? ধর্ম্মঘট ছেলেখেলা নয়,—নিরুপায় নির্য্যাতিত দরিদ্রদের শেষ অস্ত্র;—তা প্রয়োগ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করা চাই—!

অসীম নিরুৎসাহের সঙ্গে বলিল,—চেষ্টার ক্রটী করিনি কাকাবাবু,—কিন্তু তাতে কিছু ফল হয়নি। জ্যাঠা মশায় এবার সঙ্ঘের সভাপতি হতে না পেরে, শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন, তাদের বুঝিয়েছেন, ধর্ম্মঘট করলেই তাদের সব দুঃখ দূর হবে—!

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—গণপতি কি শেষে এই গরিব শ্রমিকদের উপরেও তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চায়? আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—!

······অসীম, তোমার সঙ্গে আজই আমি মায়াপুরে যাব—সঙ্ঘের সভাপতি হিসাবে আমার দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশী—

—আজই যাবেন?—

—হাঁ, আজই। কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। গণপতি আমার উপরেও তার চরম প্রতিশোধ নিতে ভোলেনি। তার কাছে আমার একটা ঋণ ছিল। সেই ঋণের জন্য আমার এই ভদ্রাসন বাড়ীখানি সে নীলামে চড়াবে নোটীশ দিয়েছে—

অসীম কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে চাহিয়া রহিল, যেন কথাটা সহসা সে বিশ্বাস করিতেই পারিল না; অবশেষে ক্ষোভে দুঃখে উত্তেজিত স্বরে বলিল,—জ্যাঠা মশায় কি এতদূর—

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিলেন,—গুরুজন যাই করুন, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে নাই। আর গণপতি তো অন্যায় কিছুই করে নি, বরং এত বৎসর ঋণশোধ করবার সুযোগ দিয়ে বাল্যবন্ধুকে অনুগ্রহই করেছে—

বিশ্বপতির এই উদারতা অসীমের মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—এই বাড়ী নীলাম হলে, এ বয়সে আপনাকে যে বিষম বিব্রত হতে হবে, কাকাবাবু—!

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—একটু হতে হবে বৈকি, অসীম! কিন্তু ভেবে দেখ কত হতভাগ্যের যে গৃহই নাই, তারা রাস্তায় বা গাছতলায় থাকে। কত হাজার হাজার লোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে অতিকষ্টে কুঁড়েঘরে মাথা গুঁজে থাকে। তাদের চেয়ে বেশী সৌভাগ্যের দাবী করবার কি অধিকার আছে আমার—?

অসীম মৃদুস্বরে বলিল,—কিন্তু—কাকীমা—

হ্যাঁ, তোমার কাকীমার মনে খুবই আঘাত লাগবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অবুঝ নন, যখন বুঝবেন—আমরা নিতান্ত নিরুপায়—

—কিন্তু কাকীমা থাকবেন কোথায়?—

বিশ্বপতি শান্তস্বরে বলিলেন,—কেন তোমার আশ্রমে গিয়ে থাকবেন!—

অসীমের বুকে কে যেন একটা বিষাক্ত শর বিদ্ধ করিল। সে প্রায় আর্ত্তনাদের স্বরে বলিয়া উঠিল,—কাকীমা থাকবেন সেই অনাথ আশ্রমে?—

অসীম নির্ব্বাক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্বপতিও তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখভাব শান্ত, দৃষ্টি স্নিগ্ধ, মন কিছুমাত্র বিচলিত বা উত্তেজিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

—কাকাবাবু—!

বিশ্বনাথ ও অসীম কথায় এমনই মত্ত ছিলেন যে, বাহিরের কোন কিছুই তাঁহাদের কাণে প্রবেশ করিতেছিল না। সহসা প্রভাত বায়ুতে আন্দোলিত স্রোতস্বিনীর মৃদু কলধ্বনির ন্যায় তরুণীকণ্ঠের মধুর স্বরলহরী শুনিয়া উভয়েই চমকিত ভাবে দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—সবিতা সেখানে দাঁড়াইয়া। তাহার কেশপাশ অযত্নবিন্যস্ত, মুখে বিষাদের ছায়া, দৃষ্টি উদ্বেগপূর্ণ ;—কিন্তু একটা শান্ত দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব তাহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সবিতাকে দেখিয়া প্রথম বিস্ময়ের আঘাতে অসীমের ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষণকালের জন্য যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এমন অকস্মাৎ এই ভাবে সবিতাকে যে দেখিবে, ইহা সে মুহূর্ত্তপূর্ব্বেও কল্পনা করে নাই! অসীমের মনে হইল, সবিতার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার নয়নমন সেই সৌন্দর্য্যময়ী প্রতিমার দিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইল।···কিন্তু সবিতার মুখে এমন বিষাদের ছায়া কেন, তাহার শরীর এমন কৃশ হইয়াছে কেন?···না, না—অসীমের এসব চিন্তা করিবার অধিকার কি? নিজের মনের দুর্ব্বলতার জন্য অসীম নিজেকে ধিক্কার দিল, কিন্তু অবাধ্য মন বশ মানিতে চাহিল না!

সবিতা জানিত, অসীম মায়াপুরেই আছে,—সুতরাং গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেই অসীমকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। একবার মনে করিল, সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই ফিরিয়া যাইবে, কাকাবাবুর সঙ্গে আর দেখা করিবে না। পরক্ষণেই ভাবিল, এ তাহার মনের শোচনীয় দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতা,—অসীমকে দেখিয়াই লজ্জায় ও সঙ্কোচে সে নিজের সঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট হইবে কেন? এ দৌর্ব্বল্যকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না।···কিন্তু অসীম-দার কান্তি এমন মলিন হইয়াছে কেন? তাহার মুখে সে প্রফুল্লতা, চোখে সে উৎসাহের দীপ্তি কই?

এই দুই তরুণতরুণীর মনোরাজ্যে যে এমন একটা আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে, বৃদ্ধ বিশ্বপতি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি সহাস্যমুখে স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন,—কে সবিতা? এস মা এস—!

সবিতা ধীর অকম্পিত পদে অগ্রসর হইল। তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া বিশ্বপতিকে প্রণাম করিয়া নতমুখে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল।

বিশ্বপতি সবিতার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, ভাল আছ মা, মুখখানি এমন শুকিয়ে গিয়েছে কেন? কোন অসুখ বিসুখ হয়নি তো?

মাতৃহীনা এই মেয়েটীকে শৈশবে তিনি কত কোলেপিঠে করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে সে এমন সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া বিশ্বপতির মন বাৎসল্যের আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল।

সবিতা মৃদুস্বরে বলিল যে, সে ভালই আছে, তাহার কোনই অসুখ করে নাই। অসীমের দিকে সে আর দৃষ্টি ফিরাইল না, বা তাহার সঙ্গে কথা বলিবারও কোন চেষ্টা করিল না। অসীমও জানলার এক ধারে গিয়া নীরবে অন্য-মনস্ক ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্য কেহ হইলে আবাল্য-পরিচিত, তরুণতরুণীর এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর তাহার চোখে পড়িত। কিন্তু আত্মভোলা বিশ্বপতি এসব কিছুই লক্ষ্য করিলেন না।

একটু পরে বিশ্বপতি বলিলেন,—এই বুড়ো ছেলের কাছে কি মনে করে এসেছ মা! আমার উপর তোমার কি হুকুম, বল—

সবিতা কিরূপে তাহার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবে, বুঝিতে পারিল না। কাকাবাবু তাহার কথা শুনিয়া হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন! অসীম-দার সম্মুখেই বা সে তাহার মনোভাব কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে? সবিতা মনের আবেগে প্রথমে এ সব ভাবে নাই; কিন্তু এখন দেখিল কাজটা খুব সহজ নহে,—তাহার চারিদিকে প্রবল বাধা যেন দৈত্যের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।···তবু তাহার কথা বলিতেই হইবে, না বলিয়া আজ সে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

প্রবল চেষ্টায় সবিতা নিজেকে সংযত করিয়া মৃদু কম্পিত স্বরে বলিল,—আপনাকে আমার একটা কথা শুনতে হবে, কাকাবাবু—

অসীম চকিত দৃষ্টিতে সবিতার দিকে ফিরিয়া চাহিল। বিশ্বপতিও সোৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিলেন,—কি কথা মা, বল—

সবিতা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল,—শুনলুম, বাবা আপনার এই বাড়ী নীলাম কর্‌ছেন—?

—হ্যাঁ মা, তোমার বাবার কাছে আমার অনেক টাকার ঋণ ছিল। শোধ করতে পারিনি—

—কিন্তু তাই বলে' আপনার বসতবাড়ী তিনি বিক্রী করে নেবেন ?

সবিতার কণ্ঠস্বরে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিস্ময় ব্যক্ত হইল।

বিশ্বপতি প্রশান্ত ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—এ আর আশ্চর্য্য কি, মা! এইত সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম! যে ঋণ করে, ঋণের দায়িত্বও তাকে বহন করতে হবে!

সবিতা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল,—কিন্তু সে নিয়ম এখানে খাটতে পারে না, কাকাবাবু! আমি কিছুতেই বাবাকে এই অন্যায় করতে দেব না—

বলিয়া সবিতা বস্ত্রান্তরাল হইতে কারুকার্য্যখচিত ছোট একটী সোণার কৌটা বাহির করিল। বিশ্বপতির সম্মুখে টেবিলের উপরে তাহা রাখিয়া কহিল,—এর মধ্যে দুখানা দামী জড়োয়া গহনা আছে, আমার মায়ের জিনিষ। এ বিক্রী করলে আপনার দেনা শোধ হবে, কাকাবাবু—

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ অবাক হইয়া সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—এই বুড়ো ছেলের উপর তোমার খুবই স্নেহ, মা! কিন্তু তোমার এ দান তো আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না! তুমি কিছু দুঃখ করো না—

সবিতা প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—কেন কাকাবাবু ?

—তোমার বাবার অজ্ঞাতে তোমার কাছ থেকে গোপনে সাহায্য নিলে, আমার যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, মা—!

সবিতা কয়েক মুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল, অবশেষে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে ব্যাকুলভাবে বিশ্বপতির পায়ের নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিল,—কাকাবাবু আমি কি আপনার মেয়ে নই,—আপনার জন্য সামান্য কিছু করবারও কি আমার দাবী নেই ? আপনাকে এ অলঙ্কার রাখতেই হবে, নইলে আমি বাড়ী ফিরে যেতে পারবো না—

এই স্নেহের প্লাবনের সম্মুখে বিশ্বপতির সমস্ত দৃঢ়সঙ্কল্প ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি বিব্রতভাবে সবিতার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে যেন কোন কথা যোগাইতেছে না। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অসীম বলিল,—কাকাবাবু, আমরা দরিদ্র, ধনীর সমস্ত নিষ্ঠুর আঘাতই আমরা সহ্য করেছি ; কিন্তু তাদের দান গ্রহণের মত দৈন্যও কি বরণ করে নিতে হবে ?

অসীমের কথা শুনিয়া, সবিতা আহত ভুজঙ্গিনীর মত মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল।

অসীম অপাঙ্গে একবার সবিতাকে দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—মিস্ রুদ্রকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তিনি আমাদের জন্য এতটা কষ্ট করেছেন! উদার মহৎ তাঁর হৃদয়! কিন্তু তাঁর এই দয়ার দান গ্রহণ করবার মত দীনতা এখনও আমাদের হয়নি, এ তাঁর জানা উচিত—!

সবিতার সমস্ত মুখ বেদনায় নীল হইয়া গেল, সে কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে আর একটা কথাও না বলিয়া, সোণার কৌটাটী তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল যে, বিশ্বপতি প্রথমে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা যখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন তিনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়া ডাকিলেন,—সবিতা—সবিতা—!

কিন্তু সবিতা সে আহ্বান শুনিতে পাইল না। ততক্ষণে সে দ্রুতগামী মোটর গাড়ীতে বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে।

বিশ্বপতি পুনরায় ডাকিলেন—সবিতা—সবিতা—

সেই ব্যাকুল কণ্ঠস্বর পথপার্শ্বের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সুপ্রভার পত্রে বাড়ীর যে ঠিকানা ছিল, তাহা বিনোদের বাড়ীর ঠিকানা নয়। গণপতি ভাবিলেন, বিনোদ বোধ হয় নূতন কোন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মোটর যখন একটা গরীব বস্তীর মধ্যে অন্ধকার গলিতে একটা জীর্ণ একতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি সত্যই বিস্মিত হইলেন। সুপ্রভা তাঁহাকে এখানে আসিতে লিখিল কেন? তাঁহার নিজেরই তো ঠিকানা ভুল হয় নাই? গণপতি পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলেন,—না, ভুল হয় নাই, সুপ্রভা তাঁহাকে এই ঠিকানাতেই আসিতে লিখিয়াছে! তবে কি বিনোদ বাবু এই ভাঙ্গা বাড়ীটাতেই উঠিয়া আসিয়াছেন?—অথবা—অথবা—

গণপতি সংশয়াকুলচিত্তে গাড়ী হইতে নামিয়া একতলা বাড়ীর দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কাহাকেও ডাকিবেন কিনা ভাবিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং সুপ্রভা আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—আসুন, মিঃ রুদ্র—

গণপতি মুহূর্ত্তকাল সুপ্রভার দিকে চাহিয়া ঈষৎ চিন্তিত ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ছোট একখানি ঘর, অত্যন্ত জীর্ণ, পুরাতন, গৃহে আসবাব পত্র কিছুই নাই বলিলেই চলে। একধারে একখানা দড়ির খাটিয়া, তাহার উপরে শয্যার মধ্যে সামান্য একখানা কম্বল বিছানো। অন্যদিকে দেয়ালে ঝুলানো দড়ির আলনায় দু এক

খানি জামা কাপড়। সুপ্রভার বেশভূষাও গৃহসজ্জারই অনুরূপ। পরণে খদ্দরের মোটা সাড়ী, হাতে দুগাছা সরু সোণার রুলী ছাড়া দেহে আর কোন অলঙ্কার নাই। কেশ-পাশ অযত্নবিন্যস্ত, যেন কতকাল কবরী বাঁধা হয় নাই, কিন্তু সীমন্তে সিন্দুরের রেখা শোভা পাইতেছে।

গণপতি একটু ইতস্ততঃ করিতে, সুপ্রভা ম্লান হাসিয়া বলিল,—এই খাটিয়ার উপরে বসুন, আর তো বসবার জায়গা নেই—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে কহিল,—খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন নয়? আপনাকে যে এখানে এই ভাবে অভ্যর্থনা করবো, দু দিন পূর্ব্বে আমিও তা ভাবি নাই—!

গণপতির বিস্ময় ক্রমেই বাড়িতেছিল। দ্বিধাজড়িত স্বরে তিনি বলিলেন,—কিন্তু ব্যাপারটা তো ভাল বুঝতে পারছি নে, মিসেস মিত্র! আপনি বাড়ী ছেড়ে এখানে—

সুপ্রভা শান্তস্বরে বলিল—এখানে থাকবো বলেই এসেছি—

গণপতি চমকিতভাবে বলিলেন,—সে কি? এখানে বস্তীর মধ্যে—এই ভাঙ্গা একতলা বাড়ীতে? মিঃ মিত্র কোথায়?

সুপ্রভা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—তিনি তাঁর বাড়ীতেই আছেন, এখন থেকে এই আমার বাড়ী!

গণপতি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা উল্লসিতভাবে তিনি বলিলেন,—বুঝেছি, আপনাদের দুজনের খুব ঝগড়া হয়েছে! তা অমন হয়েই থাকে,—দুদিন পরেই এসব মিটে যাবে! মিঃ মিত্রকেই নিজে এসে করজোড়ে

আপনার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করতে হবে—! আমি আজই গিয়ে তার ব্যবস্থা করছি—

গণপতির কথায় সুপ্রভার মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে পূর্ব্ববৎ ধীর শান্তস্বরেই বলিল,—তাঁকে আপনার কিছুই বলতে হবে না, মিঃ রুদ্র! আপনি বিশ্বাস করুন, এ ছুদিনের ঝগড়া নয়, চিরদিনের জন্যই আমরা পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করেছি--

বলিতে বলিতে সুপ্রভা একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। একটু থামিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল,—আগে ভাবতাম, বুঝি এ সম্ভব নয়, এ হতে পারে না,—ওঁকে ছেড়ে আমি একদিনও থাকতে পারবো না। কিন্তু এখন দেখছি, মানুষ যা কল্পনা করতে পারে না, জীবনে তাও নিষ্ঠুর সত্য হয়ে ওঠে—!

গণপতি কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে সুপ্রভার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—কিন্তু মিসেস মিত্র, এখনও সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় বলেই বোধ হচ্ছে। এই কয়দিনের মধ্যে এমন কি হয়েছে যে—

সুপ্রভা ম্লান হাসিয়া বলিল,—রহস্য কিছুই নয়, মিঃ রুদ্র, আমরা তুজনে জোড়াতালি দিয়ে যে সংসার গড়ে তুলেছিলাম, তার বাঁধন ছিল আলগা,—তাই যখন একটা বড় রকমের ঝাপটা এল, সে বাঁধন খুলে গেল—

গণপতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুপ্রভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

সুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—মায়াপুরের সেই দুর্যোগের রাত্রি সেইখানেই শেষ হয়ে যায় নি, আমাদের জীবনেও সে হানা দিয়েছে। ফিরে এলে, উনি বললেন, আমাকে নিয়ে তাঁর আর ঘর করা চল্‌বে না; বন্ধুবান্ধবেরাও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন,—আমাকে তাঁরা ছোঁয়াচে রোগীর মতই ভয় করেন! জীবন আমার ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল,—তাই তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি—

সুপ্রভার এই কয়টী কথাতেই বিদ্যুতালোকের মত সমস্ত ব্যাপারটা গণপতির নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী সুপ্রভা, তাহার জীবনের একি শোচনীয় পরিণতি? সে তো স্বেচ্ছায় সমাজের কোন বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে নাই। তবু তার প্রতি এই বজ্রদণ্ড! একি মানুষের সমাজ, না, হিংস্র বন্যজন্তুর অরণ্য? অসহায় নারীর উপর বিনাদোষে অত্যাচার—এ একেবারে অসহ্য! সহসা গণপতির মনে হইল, সুপ্রভার এই দুর্গতির জন্য সকলের চেয়ে বেশী দায়ী তিনি নিজে! তিনিই তো তাহাকে মায়াপুরের সভায় লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই ঔদাসীন্যে সুপ্রভার সে রাত্রি কলিকাতায় ফেরা হয় নাই। তিনি কি ইচ্ছা করিলে, যেমন করিয়াই হোক, সেই দুর্যোগের রাত্রিতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না?······ গণপতির হৃদয় তীব্র অনুশোচনায় জর্জ্জরিত হইল। অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে তিনি বলিলেন,—

—আমিই আপনার এই বিপদের জন্য দায়ী, মিসেস মিত্র!

—দয়া করে আমাকে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দিন্—

সুপ্রভা ধীরে ধীরে কহিল,—আপনার তো কোনই অপরাধ হয়নি, মিঃ রুদ্র! আপনি বরং আমাকে দেশসেবার পথে আহ্বান করে আমার সম্মুখে নূতন জগৎ খুলে দিয়েছেন—!

গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—কিন্তু আপনি এখন কি করতে চান, মিসেস মিত্র?

—সেইজন্যই তো আপনাকে ডেকেছি। আপনি আমার হিতৈষী বন্ধু, গুরুতুল্য,—আপনারই পরামর্শ আমি চাই—

গণপতির অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।···সুপ্রভা কি বলিতে চায়? কি তাহার গূঢ় অভিপ্রায়?······

গণপতির উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ নিষ্ফল প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে সুপ্রভা নিজেই কহিল,—বস্তীর এই সব গরিব দুঃখী মেয়েদের সেবায় আমি নিজেকে লাগাতে চাই। একদিন আপনিই আমাকে বলেছিলেন, দেশের শিক্ষিতা নারীরা যখন কাজে নামবে, তখনই হবে এদেশের যথার্থ মুক্তির সূচনা! আপনার সে কথা আমি ভুলিনি, ইষ্টমন্ত্রের মত অন্তরে জপ করেছি। কতদিন ভেবেছি, সেই কঠিন তপস্যার সুযোগ কোনদিনই হয়ত আমার জীবনে আসবে না—

গণপতি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমার সর্ব্বপ্রথম পরামর্শ,—আপনাকে এই নোংরা বস্তী, ভূতের বাড়ী ত্যাগ করতে হবে—

—কিন্তু এইখানে, এই গরিব পল্লীর মধ্যেই যে আমার

বেশী প্রয়োজন! তাছাড়া আমিও গরিব, এর চেয়ে ভাল বাড়ীতে থাকবার সম্বলও আমার নেই—!

গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—এই মুটে মজুর গাড়োয়ান গুণ্ডাদের মধ্যে, ভদ্রমহিলা আপনি একা থাকবেন কি করে' ভেবে দেখেছেন কি? প্রতি মুহূর্ত্তেই কত বিপদের সম্ভাবনা—

সুপ্রভা ম্লান হাসিয়া বলিল,—তাও ভেবেছি। এরা বন্যজন্তু নয়, মানুষ। এদের সবচেয়ে বড় অপরাধ, এরা গরিব। আমি ভদ্রমহিলা বলেই যে ওরা আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে, তা আমি বিশ্বাস করি নে। আপনিই একদিন আমাকে বলেছিলেন, মিঃ রুদ্র,—আমাদের মেয়েরা আজন্ম কৃত্রিম অবরোধের মধ্যে বন্দিনী থেকে জড়পদার্থ হয়ে পড়ে,—তাই অন্য দেশের মেয়েদের মত তারা জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করতে পারে না। আমি চাই সেই দুর্ব্বলতাকে জয় করতে—!

—খুবই মহৎ সঙ্কল্প, মিসেস মিত্র! আমাদের দেশের মেয়েরা যে দিন এই সব সংস্কারকে জয় করতে পারবেন, সেদিন আমার চেয়ে কেউ বেশী সুখী হবে না। কিন্তু আপনি চিরদিন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে এসেছেন,—এই দুঃখ কষ্ট আপনি সহ্য করতে পারবেন কি? মানুষের মন বহু ঊর্দ্ধে উঠতে চায়,—কিন্তু তার দেহ যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না—!

—না পারি, সেই সাধনাতেই জীবন ত্যাগ করবো। কত

দেশসেবক তো তা করছেন,—মেয়ে বলেই কি আমি সে সাধনার অধিকারী নই—?

গণপতি সহসা কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে কহিলেন,—একটা কথা আপনাকে বলতে চাই, মিসেস মিত্র,—কিছু অপরাধ নেবেন না—

সুপ্রভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গণপতির দিকে চাহিল।

—এই ভাবে, এই নোংরা বস্তার মধ্যে যদি আপনি একলা থাকেন, তবে সমাজের নিন্দুকদের রসনা যে মুখর হয়ে উঠবে—

সুপ্রভার গভীর কালো চোখ দুইটা মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়স্বরে সে কহিল,—জানি! কিন্তু যে লোকনিন্দাকে তুচ্ছ করে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছে, নিন্দুকের রসনাকে সে ভয় করে না—!

গণপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—আপনার মনের বল অসাধারণ, মিসেস মিত্র! আসলে নিন্দাকুৎসা এ সব ভীরু দুর্ব্বলকেই আক্রমণ করে, শক্তিমানের কাছে তারা ঘেঁসতে সাহস পায় না। যারা দেশসেবার আহ্বান শুনেছে, ক্ষুদ্রলোকের ছোট কথা শোনবার সময় তাদের নেই—

সুপ্রভা আবেগকম্পিত কণ্ঠে কহিল,—আমিও সেই আহ্বানে সাড়া দিতে চাই। যদি সেজন্য কঠোর দুঃখদারিদ্র্যকে বরণ করতে হয়, নিন্দা অপবাদকে অঙ্গের ভূষণ করতে হয়, তাও গ্রাহ্য করি না—

গণপতি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন,—ধন্য আপনার দেশপ্রেম,

আপনিই সাক্ষাৎ শক্তিরূপিনী! আপনার এই ত্যাগ, দৃঢ়সঙ্কল্প, অপূর্ব্বনিষ্ঠা—দেশের নারীদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করবে—!

সুপ্রভার সর্ব্বদেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, মন অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে সিঞ্চিত হইল!

একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া গণপতি কহিলেন,—কিন্তু দেশসেবা করতে হলেই যে সন্ন্যাসিনী বা ভিখারিণী হতে হবে এমনও কোন কথা নেই!······শোন সুপ্রভা, হিতৈষী বন্ধু বলে তুমি আমাকে স্বীকার করেছ, সুতরাং বন্ধুর স্নেহের অত্যাচারও তোমাকে সহ্য করতে হবে—

সুপ্রভা ভাবমুগ্ধ নেত্রে গণপতির দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনি কি বলতে চান, মিঃ রুদ্র—?

—আমি বলতে চাই, লক্ষ্মীর যোগ্য আসন শতদল পদ্ম, শ্মশান নয়! তোমাকে এ শ্মশান ছেড়ে, আমার সঙ্গে যেতে হবে, যে ব্যবস্থা করবো, স্বীকার করে নিতে হবে—

সুপ্রভা দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল,—কিন্তু—

—কিন্তু লোকে কি বলবে, অর্থ কোথায় পাবে, এই সবই তুমি বলবে! আমি বলছি, অর্থের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, সে ভার আমিই গ্রহণ করবো। তোমার জন্য এই তুচ্ছ কাজটুকু করবার সুযোগ আমি চাই—

সুপ্রভা সংশয়পূর্ণ স্বরে বলিল,—কিন্তু আপনি আমার জন্য এ সব কেন করবেন?

—কেন করবো? দেশের চিত্তশতদলে যে যুগলক্ষ্মীর সিংহাসন, তাঁকে সামান্য পূজার অর্ঘ্য দেবার অধিকারও কি আমার নেই—?

সুপ্রভার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে সে কহিল,—কিন্তু মিঃ রুদ্র, ভুল আপনার,—আমার তো সে পূজা গ্রহণ করবার যোগ্যতা নেই!

গণপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—দেবী অনেক সময় নিজের শক্তির সীমা জানেন না, ভক্তেরাই তা জানে—

সুপ্রভা উত্তরে প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, গণপতি বাধা দিয়া কহিলেন,—তোমার আর কোন আপত্তি শুনতে চাই নে, সুপ্রভা,—এবিষয়ে আমার কথাই শেষ কথা—!

গণপতি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত সুপ্রভার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—কাল আমি আসবো, তোমাকে এই নোংরা বস্তী থেকে নিয়ে যেতে—

গণপতি চলিয়া গেলে সুপ্রভা কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দ্বার-পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল। মনের উত্তেজনায় যাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, এখন সেই কঠিন বাস্তবই কদর্য্য মূর্ত্তিতে তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। গণপতির স্বার্থ কি—তাহার কথার মধ্যে কি কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে? অবশেষে তাহাকে কি গণপতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে?······ছি—ছি! এই জন্যই কি সে নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—? এই কি তাহার দেশসেবার প্রথম পুরস্কার? নিজের প্রতি একটা দারুণ ঘৃণায় সুপ্রভার সমস্ত অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।.....না—না—এ অপমান সে কিছুতেই মাথা পাতিয়া লইবে না,—কিছুতেই না—!

কবি অতুলের চিত্ত বহু নারীই এ পর্যান্ত আকর্ষণ করিয়াছে, অনেক তরুণীরই রাতুল পদতলে সে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার অভিসারের শেষ হয় নাই, তৃষ্ণা মিটে নাই!

একদিন মাধুরীর মধ্যেই সে তাহার মানসীকে লাভ করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই তাহার মনে হইল, এই তো কবির মানসী,—তাহার চিত্তসমুদ্র মন্থন করিয়া এই সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীই তো—"ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম হাতে" আবির্ভূত হইয়াছে! অমৃত, না, গরল, তাহার ভাগ্যে কি লাভ হইবে, কে জানে?

মাধুরী সুন্দরী, কিন্তু সবিতার প্রখর জ্যোতিঃর সঙ্গে মাধুরীর সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না! মাধুরী শিক্ষিতা,—তবু সবিতার তীক্ষ্ণ প্রতিভা, ক্ষুরধার মার্জ্জিত বুদ্ধির নিকট সে ম্লান! তার উপর সবিতার মধ্যে আভিজাত্যের এমন একটা সগর্ব্ব ভঙ্গিমা ছিল, যাহা অতুলের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইত এবং ঠিক সেই কারণেই তাহার হৃদয়কে আরও বেশী অভিভূত করিত। মাধুরীর মধ্যে দুর্ব্বোধ্য তো কিছুই নাই,—তাহার হৃদয় স্বচ্ছ, নির্ম্মল, অনাবিল জাহ্নবী ধারার মত!

এই কয়দিনেই সবিতার চিন্তা অতুলকে অধীর উন্মনা করিয়া তুলিল,—কবির কাব্য এই নূতন সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর বন্দনা গানেই

মুখর,—তাহার চরণের অলক্তকরাগেই রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সবিতা যে অসীমের অনুরাগিনী,—অতুলের পূজার অর্ঘ্যের দিকে সে ফিরিয়াও চাহিবে না, অতুল তাহা মনে মনে জানিত—। কিন্তু জানিয়াও এই উদাসীন নির্ম্মম সৌন্দর্য্য দেবতার আকর্ষণ হইতে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিল না ;—বরং, সবিতাকে যতই দুর্ল্লভ মনে হইত, ততই অতুলের অবাধ্য হৃদয় তাহার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িত !

সেদিন সন্ধ্যাকালে অতুল বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় মাধুরী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধুরীর প্রতি অতুল কিছুদিন হইতে তেমন লক্ষ্যই করে নাই, আজ তাহার দিকে চাহিয়া সে সহসা চমকিত হইল। মাধুরী আজ বোধ হয় বহুদিন পরে একটু ভাল করিয়া বেশভূষা পরিয়াছে,—সযত্নে কবরী বাঁধিয়াছে,—কবরীর মধ্যস্থলে "হাসনুহানা" ফুলের একটী গুচ্ছ, পরণে ধূপছায়া রঙের সাড়ী। কিন্তু বাহিরের এই বেশভূষা প্রসাধনের মধ্যেও, অতুলের চোখে পড়িল,—মাধুরীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখ, বিষাদম্লান দৃষ্টি,—কি একটা নিগূঢ় বেদনা তাহার মনে যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

অতুল নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া উঠিল,—একি, মাধুরী, —তুমি—

প্রভাত গগনে অস্তমান ক্ষীণ শশিকলার ন্যায় ম্লান হাসিয়া মাধুরী কহিল,—কেন, আমার কি আর তোমার কাছে আসতে নাই ! আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, ফুলদোলের রাত্রি,—চল না দুজনে ছাদে গিয়ে একটু বসি—

বলিয়া মাধুরী অতুলের হাত ধরিল।

অতুলের মুখ মলিন হইয়া গেল, দ্বিধাসঙ্কুচিত স্বরে সে কহিল, —কিন্তু—

—কিন্তু তোমার কাজ আছে, এই তো বলবে! কাজটাই না হয় কালকার জন্য মুলতুবী থাক,—আজ দুজনে নির্জ্জনে বসে জোৎস্নার এই উৎসব দেখি—

তারপর সহসা বস্ত্রের অন্তরাল হইতে একছড়া বকুল ফুলের মালা বাহির করিয়া কহিল—তোমাকে আশ্চর্য্য করে দেব বলে' আগে বলিনি। এ আমি নিজের হাতে গেঁথেছি,—আমার কবিকে উপহার দেবার জন্য—

অতুল দুই পা পিছু সরিয়া অনুযোগের সুরে কহিল,— কী ছেলেমানুষ তুমি, মাধুরী! আমাদের কি আর ফুলের মালা পরে' অভিনয় করবার বয়স আছে—!

মাধুরী উদ্যত হস্ত নামাইয়া লইল, তাহার চোখ দুইটী ছলছল করিতে লাগিল। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—তবে থাক! হয়ত আর কেউ এ ফুলের মালা দিলে তুমি সুখী হ'তে—আমার সে যোগ্যতা নেই—!

অতুল চমকিয়া উঠিল। মাধুরী কি সবিতার প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়াছে,—অথবা এ কেবল অভিমানের কথা? সে মাধুরীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিল,—কি যে বল, তার ঠিক নেই! আমি যদি এই বকুল ফুলের মালা গলায় দিয়ে রাস্তায় বের হই, তবে লোকে যে পাগল বলবে! লক্ষ্মীটী, তুমি রাগ করো না,—আমি বাড়ী ফিরে

এসে আজ রাত্রেই তোমার মালা পরব, এই কথা দিলাম। এখন যাই—

বলিয়া অতুল যাইবার জন্য পা বাড়াইল। মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় যাবে—সবিতাদের বাড়ী ?

অতুল থমকিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাধুরীর দিকে চাহিল। দেখিল সে মুখে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই,—শুধু একটা করুণ বিষাদের ছায়া।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অতুল কহিল—হ্যাঁ, না,—তা যেতেও পারি একবার! অন্য জায়গায় একটু কাজ আছে, তারপর যদি সময় পাই, তবে যাব। কেন, তোমার কি সবিতাকে কিছু খবর দেবার আছে ?

অতুলের মনে ভয় হইল, মাধুরী যদি জিদ করিয়া বসে, সেও সবিতাদের বাড়ী যাইবে! সংশয়ে তাহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু মাধুরী সে প্রসঙ্গও উত্থাপন করিল না। মৃদুস্বরে সে শুধু বলিল,—না, আমার কিছুই খবর দেবার নাই।······

দরজা পার হইয়া রাস্তায় নামিবার পূর্ব্বে অতুল একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল,—মাধুরী জানলার ধারে দাঁড়াইয়া তাহারই গমনপথের দিকে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি কী বিষাদ ম্লান—বেদনাকাতর!

অতুল তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল, আর সে দিকে চাহিতে সাহস করিল না, কিন্তু সেই বেদনাকাতর দৃষ্টি, বিষাদ-করুণ মুখ কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিল

না, তাহারা যেন তপ্তশলাকার মত মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া রহিল।

গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া অতুল চলিয়াছিল। গঙ্গাবক্ষে তখন বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারা পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা অতুলের ছিল না। সে কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত সবিতাদের বাড়ীর দিকে চলিল।

কিন্তু সবিতাদের বাড়ীর সদর ফটকে প্রবেশ করিতেই তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, গলা বুক শুকাইয়া আসিল। সেই বেদনাকাতর দৃষ্টি এখনও তো তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই, ইহাকে বুকে পুষিয়া সবিতার দিকে সে চাহিবে কিরূপে? তাহার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিবেই বা কেমন করিয়া!

একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া অতুল জানিল, সবিতা বাহিরের বাগানেই আছে। সে কম্পিত চরণে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বাগানের একপ্রান্তে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় সবিতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। দূর হইতে জ্যোৎস্নালোকে অতুলের মনে হইল, যেন কোন শিল্পী-কবি কোন সুন্দরীর মর্ম্মরমূর্ত্তি গঠন করিয়া সেখানে রাখিয়া দিয়াছে। সবিতা আপনার চিন্তারাশির মধ্যে এমন তন্ময় হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল যে, অতুল তাহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেও, সে বুঝিতে পারিল না। অতুলও সেই মর্ম্মর মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে অতুল কহিল—নমস্কার, সবিতা দেবী—

সবিতা সুপ্তোত্থিতের মত বিস্মিত চকিতভাবে মাথা তুলিয়া অতুলকে দেখিয়া অপ্রতিভাবে বলিল,—কে,—অতুল বাবু? আসুন—

সবিতা ঘাসের উপর বসিয়াছিল, অতুলকে বসিতে দিবার মত কোন আসনও সেখানে ছিল না। সবিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, অতুল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল,—থাক, থাক,—আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না, আমি বেশ বসেছি। এর চেয়ে চমৎকার আসন আর কি হতে পারে, এ প্রকৃতি দেবীর নিজের হাতে তৈরী—!

সবিতা শুধু একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া অতুল বলিল,—আপনাকে আজ বড়ই বিষণ্ণ মলিন দেখাচ্ছে, সবিতা দেবী। বোধ হয় মনটা তেমন ভাল নেই—

সবিতা জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, —কই কিছুই তো হয়নি! সন্ধ্যা বেলাটা প্রায়ই এখানে এসে নিরালায় বসি।···আমরা তো আপনাদের মত কবি নই যে, মেঘ দর্শনে বা জ্যোৎস্নালোকে ভাবান্তর হবে—!

অতুল একটু জোরের সঙ্গেই বলিল,—স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমি কবি, সুতরাং অপরাধী। বিশ্বের এই অনন্ত সৌন্দর্য্য, তার আকাশ জল বাতাস, আলো আঁধারের খেলা, জ্যোৎস্নার প্লাবন, ফুলের হাসি, আমার প্রাণে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আমি তাদের গান গাই। প্রজাপতি যেমন আলোতে তার পাখা মেলে নৃত্য করে বেড়ায়, আমিও তেমনি এই

সৌন্দর্য্যের গান গেয়ে জীবন কাটাতে চাই, দুঃখকে আমি মানি নে—!

সবিতা ধীরে ধীরে বলিল,—দুঃখকে আপনি না মানলেও সে যে আছে! এমন কি, কারু কারু মতে, দুঃখই জগতের একমাত্র সত্য বস্তু। আমরা যাকে সুখ বলি, সেই জিনিবটাই বরং মায়া মরীচিকা—!

—আপনি যে পূরাদস্তুর দার্শনিক হয়ে উঠলেন, সবিতা দেবী! কিন্তু আমি কবি, আমি বলি, সৃষ্টিতে দুঃখ বলে কোন বস্তু থাকতেই পারে না। যে সৃষ্টিতে নারীর স্থান আছে, দুঃখ তার ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি নে—

সবিতা ঈষৎ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চাহিল।

অতুল কহিতে লাগিল,—নারীই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সৌন্দর্য্যের সার, আনন্দের উৎস,—কবির চিত্ত নিত্যকাল তারই আকর্ষণে সাগরবারির মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে—

সবিতা এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—বিধাতা যে এমন একচোখো, নারী জাতির উপরেই তাঁর এমন পক্ষপাত, তা তো জানতুম না! কিন্তু কবিদের এই অতিরিক্ত নারী-ভক্তির মূলে অনেকখানি গলদ আছে, এও তো অস্বীকার করা যায় না,—অতুল বাবু—!

অতুল অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—এমন ভাবে আমার কথাটা উড়িয়ে দিলে চলবে না, সবিতা দেবী! আপনিই বলুন, আদি কবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে, অতি-আধুনিক এই দীন

অতুল রায় পর্য্যন্ত কোন কবির বীণা নারীর জয়গানে মুখর হয়নি—?

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিল,—কিন্তু বিশ্বে তো আরও অনেক সুন্দর মহান্ বস্তু আছে, অতুল বাবু,—যারা কবির বীণার অযোগ্য নয়। আপনি ভালবাসেন কেবল সৃষ্টির কোমল সুকুমার রূপ,—কিন্তু যা ভীষণ, রুদ্র, কঠোর, তাও কি সুন্দর নয়?

অতুল তন্ময়ভাবে সবিতার বাক্যসুধা পান করিতেছিল, উত্তর দেবার কথা তাহার মনে ছিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল,—আমার নূতন নারী বন্দনা কবিতা শোনেন-নি বুঝি! শুনলে বুঝতে পারবেন, নারীকে কত উচ্চে স্থান দিয়েছি আমি—

বলিয়া সবিতার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই অতুল আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে লাগিল,—নারী, তুমি সৃষ্টির মধ্যমণি, নিখিল সৌন্দর্য্যের সার,—আকাশের নীলিমা, বনানীর শ্যামলিমা, জ্যোৎস্নার মধুরিমা, তোমারই যৌবনশ্রীতে অভিব্যক্ত! তোমার বচনে সঙ্গীত, দৃষ্টিতে বিদ্যুৎবিলাস, গতিতে মোহন ভঙ্গিমা। জড়-বিশ্বের তুমিই প্রাণ, তুমিই রস—তুমিই রূপ! যুগে যুগে জন্ম হ'তে জন্মান্তরের পথে কবি তোমারই অভিসারে যাত্রা করেছে। কিন্তু তুমি নিত্য ছলনাময়ী, চঞ্চলচরণে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কবির দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করেছ! হে নিষ্ঠুরে, কবির এই সুদীর্ঘ অভিসারের কি কোন দিন শেষ হবে না, তার হৃদয় শতদলে প্রসারিত আসনে তুমি কি কোনদিনই তোমার রাতুলচরণ স্থাপন করবে না—?

সবিতা সকৌতুকে বলিল,—চমৎকার কবিতা হয়েছে, অতুল

বাবু! এ কবিতা শুনেও যদি নারীরা তাদের এমন একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন না হয়, তবে তারা নিতান্ত হৃদয়হীন বলতে হবে! মাধুরীকে কবিতাটা নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে শুনিয়েছেন। সেই তো এই কবিতার উৎস! দেবী প্রসন্না হয়ে 'ভক্তকবিকে কি বর দিয়েছেন শুনতে পাব না কি?

অতুলের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—না, মাধুরীকে শুনাইনি! আপনি ভুল বুঝেছেন সবিতা দেবী! মাধুরী আমার কবিতার উৎস নয়। আমার কবিতার উৎস—আমার মানসী, যিনি আমার সমস্ত অন্তর লোক পূর্ণ করে আছেন—

সবিতা সবিস্ময়ে বলিল,—ওমা তাই নাকি? আপনার এই নূতন মানসীটার খবর তো আমরা জানতুম না! বলুন না, সে কোন অপ্সরী, কিন্নরী বা বিদ্যাধরী? না, অলকাবাসিনী কোন চির-বিরহিনী যক্ষপত্নী?

অতুল গদগদস্বরে বলিল,—অলকাবাসিনীই বটে, তবে সে অলকা বাহিরে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে নয়, আমারই অন্তরের মণিকোঠায়। আমার অতি নিকটেই রয়েছেন তিনি, প্রত্যক্ষই তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্ছি,—কিন্তু তবু তাঁর আর আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। তাই কালিদাসের যক্ষের মত আমিও মেঘদূতের হাতে আমার প্রিয়ার কাছে বিরহের বার্ত্তা পাঠিয়েছি—

শুনুন, আমার 'নব মেঘদূত' কাব্য—বলিয়া অতুল উচ্ছ্বাস পূর্ণ স্বরে পুনরায় আবৃত্তি করিতে লাগিল,—হে মেঘ, কালিদাসের বিরহী যক্ষের দূতরূপে তোমাকে আকাশপথে অলকার উদ্দেশে

বহুদূর যাত্রা করতে হয়েছিল। কিন্তু এবার আমার মানসা-কাশেই তোমার যাত্রাপথ,—আমারই অন্তরের মণিকোঠায় রত্ন বেদীতে যিনি চরণকমল স্থাপন করেছেন, সেই অলকা-বাসিনীর নিকটেই আমার প্রণয়ের অর্ঘ্য তোমাকে বহন করতে হবে। যক্ষ তাঁর প্রিয়তমাকে চেন্‌বার জন্য তোমাকে অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার এ অলকাবাসিনীকে জান্‌বার জন্য কোন অভিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই, কেননা, তিনি সবিতার মত দ্যুতিময়ী, স্বপ্রকাশ,—তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তোমার দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, অন্তর অমৃতরসে সিঞ্চিত হবে। হে মেঘ, তোমার জয় হোক, চঞ্চলা বিদ্যুৎ তোমার বক্ষে মণিহারের ন্যায় অচঞ্চলা হয়ে বিরাজ করুক—

কবিতা শুনিতে শুনিতে সবিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল। প্রবল চেষ্টায় আত্ম-দমন করিয়া সে মৌন গম্ভীর হইয়া রহিল, কোন কথাই বলিল না।

কিন্তু সবিতার অভিমত শুনিবার জন্য অতুলের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, উৎকণ্ঠায় তাহার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল, যদিও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সে সাহস পাইতেছিল না। অবশেষে সবিতার অটল গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া, অতুল ভয়ে ভয়ে সংশয়কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার “নব মেঘদূত” কাব্য, কেমন লাগল, সবিতা দেবী—

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিল,—মনে হ’ল, আপনি স্বপ্ন বিলাসী, কেবল মরীচিকার পিছনে ছুটে শক্তি ক্ষয় করছেন—

—কিন্তু যা দুর্ল্লভ, দুজ্ঞেয়, রহস্যময়, তারি সন্ধানে তো কবির আনন্দ। সিদ্ধি সে চায় না, অভিসারেই তার জীবনের সার্থকতা—

সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—ও সব অর্থহীন হেঁয়ালী বুঝি না, কবি। আপনি দুঃখকে মানতে চান না, রুদ্রের ভীষণতা সহ্য করতে পারেন না, ভয়ে চোখ বন্ধ করেন। কিন্তু এই যে জগতের লক্ষ লক্ষ মানুষ, নিত্য দুঃখের হলাহল পান করছে, তাদের জীবনের উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে—রুদ্রের এ ভীষণমধুর রূপের মধ্যেও কি সৌন্দর্য্য নাই? কবি, কেবলই স্বপ্নের গান গাইবেন না,—লক্ষ লক্ষ মানবের দুঃখকে হৃদয়ে অনুভব করুন, তাদের জ্বালাময় বেদনাকে ভাষা দিন, আপনার বীণা সার্থক হবে। নারীর বন্দনাতেই কি আপনি সমস্ত পূজার অর্ঘ্য নিঃশেষ করবেন? রুদ্রের প্রলয়তাণ্ডবের ছন্দে কি আপনার হৃদয় নৃত্য করবে না? শুনুন, কবি, এ যুগের নারীরা—দুর্ব্বল, স্বপ্নবিলাসী, নারীর করুণাভিখারী কবিদের অবজ্ঞার চোখেই দেখে,—শ্রদ্ধা করতে পারে না, এ যে তাদের কত বড় দুঃখ—!

সবিতার কথা শুনিতে শুনিতে অতুলের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, নতশিরে ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল,পৃথিবী তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্নার আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে।···

সবিতা কি বলিয়া অতুলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে

ভাবিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,—দিদিমণি, শীগগীর আসুন, বাবু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন—

সবিতা দুইবার হোচট খাইয়া পড়িয়া ছুটিতে ছুটিতে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—হঠাৎ কেন এমন হ'ল, জানিস্ শিবু?

—তাতো জানিনে, দিদিমণি! বিনোদবাবু এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কি হল—

সবিতা প্রাণপণ বেগে পিতার ঘরের দিকে ছুটিতে লাগিল।

গণপতি সমস্ত দিন সুপ্রভার নূতন বাড়ীর জন্য আয়োজন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে তিনি গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু গাড়ী হইতে ফটকের নিকটে নামিয়াই তাঁহার মনে হইল কন্যা সবিতার কথা। তাঁহার শরীর ভাল নয় বলিয়া সবিতা তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, চোখে চোখে রাখে, এমন কি তাঁহার যাহাতে বেশী মানসিক পরিশ্রম বা উত্তেজনা না হয়, সে দিকেও সবিতার সতর্ক দৃষ্টি। আজ তিনি সবিতার অলক্ষ্যে, তাহাকে কিছু না বলিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সবিতা না জানি তাঁহার জন্য সারাদিন কত উদ্বেগে কাটাইয়াছে! সবিতার অভিমানপূর্ণ অনুযোগ, মৌন তিরস্কারসূচক দৃষ্টি কল্পনা করিয়া গণপতির মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সবিতার নিকটে তিনি কি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিবেন? না,—কোন কথা সবিতাকে এখন না-বলাই ভাল।...হয়ত সে কি মনে করিবে,—ব্যাপারটা ভাল না বুঝিতে পারিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বসিবে।...

এই সব চিন্তা করিতে করিতে গণপতি নিজের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সবিতাকে সেখানে না দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, সবিতা নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে।

ভৃত্য শিবু কহিল,—দিদিমণি বাগানে বসে অতুল বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন,—ডেকে আনি—

—না থাক, ডাকতে হবে না।

গণপতি পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া ক্লান্তভাবে একটা আরাম চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন। এবং আলবোলার নল মুখে দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তামাক টানিতে টানিতে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

...সুপ্রভার নিকটে কাল সকালেই যাইতে হইবে। আজ যাইতে পারেন নাই, সেজন্য সুপ্রভা হয়ত কত কি ভাবিতেছে। একা একা তাহার কত কষ্টই হইতেছে! কিন্তু সুপ্রভা যখন সমস্ত কথা জানিতে পারিবে, তখন নিশ্চয়ই সুখী হইবে। সুপ্রভার সুগৌর মুখের সেই প্রসন্নমধুর হাস্য কল্পনা করিয়া গণপতির দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠিল।...যুগলক্ষ্মীর পূজার আয়োজন যথাযোগ্য ভাবেই তাঁহাকে করিতে হইবে। সুপ্রভা যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও কিছুর অভাব বোধ না করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।...গণপতি নিজে প্রত্যহ গিয়া সুপ্রভার তত্ত্ব লইবেন। সবিতাকে বলিবেন, একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক তাঁহাকে লেকরোডের ধারে প্রত্যহ বেড়াইতে পরমর্শ দিয়াছেন।...সবিতা তাহা হইলে আর আপত্তি করিবে না,—বরং খুসীই হইবে! কিন্তু সে যদি কোন দিন সঙ্গে যাইতে চায়!...না, না, কোন একটা অজুহাতে তাহাকে সে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।...

গণপতির বসিবার ঘরে তাঁহার পরলোকগতা পত্নী সবিতার জননীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি ছিল। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে সেই ছবির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সহসা তাহার মনে হইল, ছবিখানি যেন দুলিতেছে!...

তাহার ভ্রুযুগ কুঞ্চিত, অধর স্ফুরিত, চোখ দুইটী যেন জ্বলিতেছে। ছবিখানি ক্রমেই বড় হইতে লাগিল, শেষে একটী

জীবন্ত নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। গণপতির দেহ শিহরিয়া উঠিল।...

এ কি! নারীমূর্ত্তি দেয়াল হইতে নামিয়া গণপতির দিকেই যে অগ্রসর হইতেছে! তাহার ভ্রূযুগ আরো কুঞ্চিত, চোখে সেই তীব্র ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টি! গণপতির হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ, হাত পা অবশ হইবার উপক্রম হইল। একবার মনে ভাবিলেন, নারী মূর্ত্তিকে তিনি নিকটে আসিতে নিষেধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইল না।...মূর্ত্তি ক্রমেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অবশেষে ঠিক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।... গণপতি ভয়ে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবার পর, তিনি যেন পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিলেন,—মিঃ রুদ্র—!

গণপতি চোখ মেলিয়া দেখিলেন—সম্মুখে বিনোদ মিত্র দাঁড়াইয়া!...তাঁহার তো কোন ভুল হয় নাই? সেই নারীমূর্ত্তি কোথায় গেল, তাহার স্থানে বিনোদ আসিল কিরূপে? গণপতি দুইহাতে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,— কোন ভুল হয় নাই। বিনোদই বটে, দেয়ালের ছবি পূর্ব্ববৎ সেইখানেই আছে!

বিনোদ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—ভাল আছেন মিঃ রুদ্র,—কয়েক দিন আপনার কোন খবর পাই নি—

গণপতি আরাম চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, সবিস্ময়ে বিনোদের দিকে চাহিলেন। অবশেষে বিনোদ যে তাঁহার সঙ্গে এই ভাবে দেখা করিতে আসিবে, ইহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা

করিতে পারেন নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয়,—বিনোদের মুখের নির্ব্বিকার ভাব, তাহার সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর—! এ কয়দিনের ভিতর যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, এই লোকটার মনে তাহার দাগ কি একেবারেই পড়ে নাই? গৃহত্যাগিনী পত্নীর জন্য তাহার হৃদয় বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ চঞ্চল হয় নাই!···অথবা এ লোকটা অতি সুচতুর অভিনেতা,—নিজের মনের ক্ষোভ, রোষ, ঘৃণা—নিপুণভাবে গোপন করিতে পারে!

কিন্তু গণপতি তো বিনোদের মত অভিনয় করিতে পারিবেন না,—উহাকে দেখিয়াই যে, তাঁহার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে তাঁহার নিকট সুপ্রভার গৃহত্যাগের কথাই বলিতে আসিয়া থাকে, যদি তাঁহাকেই সে জন্য দায়ী করে! গণপতির অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। একহাতে কপালের ঘাম মুছিয়া, ঈষৎ জড়িতস্বরে তিনি বলিলেন,—না, শরীরটা ভাল নেই, এ কয়দিন তো বাড়ী থেকে বেরুতেই পারিনি—ডাক্তারের নিষেধ—

বিনোদের অধরপ্রান্তে মুহূর্ত্তের জন্য কুঞ্চিত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে পূর্ব্ববৎ সহজ স্বরেই বলিল,—তবে তো ভাবনার কথা—! আপনাকে বিরক্ত বা উত্তেজিত করা ঠিক নয়। কিন্তু······কাজটাও বড় গুরুতর—আপনাকে না বললে নয়—

গণপতি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—নিশ্চয়ই সেই কথাই বলিবার জন্য বিনোদ আসিয়াছে। একবার বলিতে ইচ্ছা হইল, যতই গুরুতর কাজের কথা হোক, আজ শুনিবার সময় তাঁর নাই। কিন্তু কেমন একটা দুর্ব্বলতা আসিয়া তাঁহার

সে সঙ্কল্পের পথরোধ করিল। তিনি কিছুতেই বিনোদকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। প্রকাশ্যে বলিলেন—

—না—না, এমন কিছু ভয়ের কথা নাই! বলুন আপনি—

বিনোদ দুই একবার কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—কথাটা আমাদের 'সঙ্ঘের' সম্বন্ধে। এবার আপনি প্রেসিডেণ্ট, আমি সেক্রেটারী। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাগজপত্র আপনি কিছুই দেখেন নি—

গণপতির মন হইতে যেন একটা পাষাণভার নামিয়া গেল। যাক, আর কিছু নয়—সঙ্ঘের কথা বলিবার জন্যই বিনোদ আসিয়াছে! তিনি একটু খুসী হইয়াই বলিয়া উঠিলেন—

—তার জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, বিনোদবাবু! আপনি তো আর নূতন লোক নন;—একটু ভাল বোধ করলেই এর মধ্যে একদিন সঙ্ঘের আফিসে যাব—

—তা না হয় যাবেন! কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটেছে, যা আপনার এখনই শোনা দরকার—

গণপতি চমকিতভাবে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন।

—মায়াপুরের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করেছে, কলকারখানা কাজকর্ম্ম সব বন্ধ। হতভাগারা ধর্ম্মঘট করবার আগে কিছু জানায় নি, এখন বলছে, 'বালবাচ্চা' নিয়ে তারা না: খেয়ে মরছে—

গণপতি চিন্তিতভাবে কহিলেন,—তাই তো বড় মুস্কিলের কথা!...সঙ্ঘের একটা ধর্ম্মঘট ফণ্ড ছিল নয়?

—ছিল,—শ্রমিকেরা তাতে হাজার দশেক টাকা চাঁদাও দিয়েছিল—কিন্তু—

গণপতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন।

—সে ফণ্ডের টাকা সব খরচ হয়ে গেছে!

গণপতি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এত ট্যাকা খরচ হ'ল কিসে? কই, আমি তো কিছুই জানি নে—

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনাকে জানাবার সময় হয় নি, মিঃ রুদ্র। ব্যাপারটা খুবই জরুরী কিনা।—বিলাত, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, রাশিয়াতে সঙ্ঘের তরফ থেকে প্রচারের কাজ করবার জন্য টাকাটা দিতে হয়েছে—

গণপতি সবিস্ময়ে কহিলেন,—শুধু বিদেশে প্রচারের জন্য এত টাকা!

বিনোদ অবিচলিত স্বরে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলিল,—দশ বিশ হাজার টাকা সমুদ্রে বারিবিন্দু, আমেরিকায় এমন সব কাজে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়! আর এতে আমাদের 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল' প্রেষ্টিজ কত বেড়ে গেছে—!

'ইণ্টার ন্যাশন্যাল প্রেষ্টিজ' কতটা বাড়িয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, টাকাটা যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহা বুঝিতে গণপতির বিলম্ব হইল না!···কিন্তু ইহার প্রতিকার করিবার সাধ্য গণপতির এখন নাই,—তিনি নিরুপায়,—এই জঘন্য প্রকৃতির লোকটা কি এক অজ্ঞাত পৈশাচিক শক্তির বলে, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ, হস্তপদ যেন অবশ করিয়া দিয়াছে। অথচ এ ব্যাপারের সমস্ত দুর্ণামের বোঝা তাঁহারই ঘাড়ে আসিয়া চাপিবে!—গণপতি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বিনোদ অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চিন্তামগ্ন গণপতির দিকে চাহিয়া বলিল,—এই রাস্কেলগুলো যাতে ধর্ম্মঘট শীগ্‌গীর বন্ধ করে, আপনি তার একটা ব্যবস্থা করুন—

গণপতি কোন উত্তর দিলেন না, তাঁহার চোখে মুখে একটা হতাশ ভাব ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—সঙ্ঘের একটা সভা ডাকুন। আমি নিজের দায়িত্বে এত বড় গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করতে চাইনে—

—বেশ তাই ডাকবো,—কিন্তু এমন জরুরী ব্যাপারে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা চলে কিনা সন্দেহ!

বিনোদ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কি একটা বিস্মৃতপ্রায় কথা যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলিল,—হ্যাঁ, আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। সুপ্রভার বিরুদ্ধে আমি শীঘ্রই একটা 'ডাইভোর্সে'র' মামলা আন্‌ছি—

গণপতি চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,—ডাইভোর্সের মামলা মিসেস মিত্রের নামে? সে কি কথা—অ্যাঁ—!

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল,—কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নয় মিঃ রুদ্র!—আপনাকেও আসামী হতে হবে কিনা—!

গণপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, দুই চক্ষু যেন কোটর হইতে ঠিকরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—অ্যাঁ, আমাকেও আসামী হতে হবে!—কেন—কেন—?

বিনোদ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল,—কেন,—তা আপনারই জানবার কথা !

গণপতি অবসন্নভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

বিনোদ পকেট হইতে ধীরে ধীরে একটা চুরুট বাহির করিয়া মুখে দিয়া অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তাহা ধরাইল, তারপর ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বলিল,—কিন্তু, আপনি আমার অনেক দিনের বন্ধু, মিঃ রুদ্র, আপনাকে ডুবিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার নেই।…আমি মামলা না করতে পারি যদি—

গণপতি উৎকণ্ঠিত ভাবে বিনোদের মুখের দিকে চাহিলেন।

বিনোদ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চুরুট টানিতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল,—যদি আপনি আমাকে এক লাখ টাকার একখানা চেক লিখে দেন—

গণপতি কিছুক্ষণ বজ্রাহতবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অবশেষে প্রায় আর্ত্তনাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বিনোদ বাবু, এ ঘোর অন্যায়—ব্ল্যাকমেলিং—আপনার কাছে আমি এমন প্রত্যাশা করিনি—

বিনোদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে বলিল,—অনেকের কাছেই অনেক জিনিষ লোকে হয়ত প্রত্যাশা করে না। কিন্তু সে সব কথা থাক্ ! আপনারা দুজনে মিলে আমার সংসার ভেঙ্গেছেন, জীবন মরুভূমি করেছেন,—এক লাখ টাকা তার তুলনায় কি নিতান্ত তুচ্ছ নয় ?

গণপতি কাতর অনুনয়ের স্বরে বলিলেন,—বিনোদবাবু—!

বিনোদ অবিচলিত স্বরে বলিল,—না, মিঃ রুদ্র! এই আমার শেষ কথা। এক লাখ টাকার চেক পেলে, এদেশ ছেড়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব।···তা না হয় তো, আপনাদের দুজনকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে···

বলিয়া বিনোদ দিয়াশালই জ্বালিয়া অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটী আবার ধরাইয়া লইয়া সজোরে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

গণপতি কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর মোহাবিষ্টবৎ কম্পিতহস্তে একটা দেরাজ খুলিয়া চেকবহি বাহির করিলেন। চেকবহিখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, কলম হাতে কয়েক মিনিট ভাবিলেন, অবশেষে সহসা অত্যন্ত দ্রুতবেগে এক লাখ টাকার একখানা চেক সহি করিয়া, বিনোদের হাতে গুঁজিয়া দিয়া অবসন্নভাবে আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলেন।

বিনোদ ধীরে ধীরে চেকখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল, এবং মৃদু হাসিয়া গণপতিকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল,— আমার কথা আমি রাখবো, মিঃ রুদ্র। এই সপ্তাহের মধ্যেই বোম্বাই বন্দরে পৌঁছে আপনাকে তার করবো—

বিনোদ ধীরে মন্থর গতিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যতক্ষণ সে দ্বার অতিক্রম না করিল,—গণপতি ভূতদর্শন-ভীত ব্যক্তির ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বিশ্বপতি আশ্রমের একটী ঘরে চিন্তিত ভাবে বসিয়াছিলেন, সম্মুখে কতকগুলি খাতাপত্র। তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মদাস মালাজপ করিতেছিল। তাহার গায়ে নামাবলী, কপালে চন্দনের রেখা ; কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সে প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়াছিল।

বিশ্বপতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—তোমাকে নিরীহ ধর্ম্মভীরু লোক বলেই জানতাম, ধর্ম্মদাস—! কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে আশ্রমের পাঁচ হাজার টাকা চুরি—কোন হিসাব নাই, কৈফিয়ৎ নাই—এতো উপেক্ষা করা যায় না—!

ধর্ম্মদাস মালা জপিতে জপিতে বলিল,—দোহাই দেবতা, আমাকে অপরাধী করবেন না,—আশ্রমের টাকা আমার নিকট গোমাংস তুল্য! আমি হিঁন্দু হয়ে কি তার এক পয়সাও অপব্যয় করতে পারি—তার পূর্ব্বে আমার মৃত্যুও বরং ভাল ছিল—! মা জগদম্বে—!

বিশ্বপতি সে কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বলিলেন,—তুমি জান ধর্ম্মদাস, আশ্রমের এ টাকা ভিক্ষালব্ধ, কত কষ্ট করে কত লোকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে! আর যারা অনাথ নিরুপায়, সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, তাদেরই সেবার জন্য এই টাকা! তারা যে নারায়ণ! তুমি সেই নারায়ণের সম্পত্তি—দেবতার ধন অপহরণ করেছ—!

ধর্ম্মদাস আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—আমি করি নি, আমি করি নি—! যদি করে থাকি তবে যেন অনন্ত নরকেও আমার

স্থান না হয়—! তারা—তারা—শেষে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই দুর্ণামের ভাগী হতে হল! যে আমি ত্রিসন্ধ্যা স্নান, গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করে জল গ্রহণ করিনে,—তারই বিরুদ্ধে এই অপবাদ! কলিতে কি ধর্ম্ম একেবারে লোপ পেয়েছে!

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—শোন ধর্ম্মদাস, তোমাকে এতদিন বিশ্বাস করে ভুল করেছি কিন্তু আর নয়—! আমি তোমাকে সাতদিনের সময় দিলাম, এর মধ্যে আশ্রমের পাঁচ হাজার টাকা এনে দিতে হবে। নইলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে! আর এ আশ্রমের ত্রিসীমানায় তোমাকে কখন দেখতে চাইনে—!

ধর্ম্মদাস দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল,—দোহাই ধর্ম্ম, আমার এ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করবেন না! এত টাকা সাত দিনের মধ্যে আমি কোথায় পাব? আমার দেহের শিরা উপশিরা একটা একটা করে কেটে ফেললেও নয়—!

বিশ্বপতি উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় অসীম ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া বলিল,—মহা বিপদ উপস্থিত, কাকাবাবু! প্রায় তিন চার শো মজুর ছেলেমেয়ে নিয়ে আশ্রমের আঙ্গিনার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারা বলছে, যদি খেতে না পায়, এখান থেকে এক পাও নড়বে না—!

বিশ্বপতি খাতাপত্র ফেলিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন এবং কোন কথা না বলিয়া বাহিরের আঙ্গিনার দিকে ছুটিলেন।

বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইতেই যে দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। রাস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমের

বাহিরের আঙ্গিনা পর্য্যন্ত লোকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কঙ্কালসার দেহ, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, জীর্ণ মলিন বসন,—দেখিলে মনে হয়, এরা এ লোকের জীব নয়, এইমাত্র শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিয়াছে! আঙ্গিনার ভিতরে অধিকাংশই স্ত্রীলোক, তাহাদের পরিহিত বস্ত্রের অবস্থা এমন শোচনীয় যে, গভীর লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে চোখ ফিরাইয়া লইতে হয়। তাহাদের দুই চক্ষু কোটরে বসিয়া গিয়াছে, পাঁজরার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মুখের উপর যেন মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনেকেরই কোলে ছেলেমেয়ে,—তাহারা মায়ের বুকে দুধ পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া, কাতর চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। কতকগুলি উলঙ্গ বালকবালিকা বোধ হয় 'মরিয়া' হইয়া আশ্রমের বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমস্ত দৃশ্য এমনই করুণ, মর্ম্মান্তিক শোকাবহ যে, বিশ্বপতি ও অসীম কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহাকেও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। মানুষের দুর্দ্দশা যখন চরম সীমা অতিক্রম করে, তখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে লোকে এমনই মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

বারান্দার উপরে যে সব নগ্নদেহ ছেলেমেয়ে উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৯।১০ বৎসরের একটী বালক, বিশ্বপতির নিকটে আসিয়া পেটে হাত দিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল,—বাবুজী, আজ তিন দিন কিছু খেতে পাইনি,—আমাকে খেতে দাও।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, অন্য ছেলেমেয়েরাও

আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল,—খিদেয় আমাদের পেট জ্বলছে, আমাদের খেতে দাও, খেতে দাও—

একটী স্ত্রীলোক ছেলে কোলে করিয়া বারান্দার নীচেই দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বিশ্বপতিকে দেখিতেছিল। সহসা সে প্রাণপণ বেগে বারান্দার উপরে উঠিয়া, কোলের ছেলেটাকে বিশ্বপতির পায়ের নীচে ফেলিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—আমার এই ছেলেকে আজ দু দিন হ'ল এক ফোটা দুধ দিতে পারিনি;—ওকে বুঝি আর বাঁচাতে পারবো না। বাবু দয়া কর, এক ফোটা দুধ দাও—

অসীম দুধ আনিবার জন্য দ্রুতবেগে আশ্রমের ভিতরে ছুটিল। বিশ্বপতি পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার বুকের ভিতর কে যেন, তপ্তশলাকা দিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। এই মানুষ,—অন্নাভাবে এদের দশা পশুর চেয়েও শোচনীয়! ভগবান মানুষকে এমন অসহায় করিয়াছ কেন?

একজন কঙ্কালসার বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী, বারান্দার একপ্রান্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে "হায় হায়" করিতেছিল। বিশ্বপতি তাহার নিকটে গিয়া তাহার কাঁধের উপর এক হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছে, ভাই?

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিয়া বিশ্বপতির মুখের দিকে একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল, যেন প্রশ্নটা তাহার কাণেই যায় নাই। তারপর ধীরে ধীরে একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

—হায়—হায়, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, সব গেছে—সব গেছে!

বিশ্বপতি সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, ভাই, আমাকে বলবে না ?

—আমার মেয়ে লক্ষ্মী কয়দিন না খেতে পেয়ে মারা গেছে। ছেলে বিশু খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়ে কোন দিকে চলে গেছে—

বলিয়া বৃদ্ধ কপালে ঘনঘন করাঘাত করিতে লাগিল।

বিশ্বপতি কহিলেন,—তুমি কি কারখানায় কাজ কর—? কেন ধর্ম্মঘট করেছ ?

বৃদ্ধ কাতর স্বরে বলিল,—আমি এই কারখানারই মজুর,—কিন্তু ধর্ম্মঘট ইচ্ছা করে করিনি—আমাকে ওরা জোর করে করিয়েছে,—

—কে তোমাদের ধর্ম্মঘট করতে বলেছে—?

বৃদ্ধ এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল,—ওই বিষণ সর্দ্দারই তো সবাইকে জোর করে ধর্ম্মঘট করালে,—কোন রুদ্দর সাহেব নাকি হুকুম দিয়েছে। যে ধর্ম্মঘট না করবে, তাকে জাতে আটক করবে, এই সর্দ্দারের হুকুম—!

বিশ্বপতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সর্দ্দারের কাছেই কেন খেতে চাইলে না ?

—তাকি আর চাইনি, বাবুজী। কিন্তু সর্দ্দার আমাদের হাঁকিয়ে দিলে, বললে, দুদিন কি আর না খেয়ে থাকতে পারবি নে—?

বলিয়া বৃদ্ধ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল,—যে ঘরে বাল-বাচ্চা

নিয়ে ছিলাম, কারখানার জমাদার ম্যানেজার সাহেবের হুকুমে তা থেকেও আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। পথ ছাড়া আমাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, শেয়াল কুকুরের মত এই পথেই না খেয়ে আমাদের মরতে হবে। বাবুজী, শুনেছি, আপনার দয়ার শরীর, আপনি আমাদের রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—!

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বোধ হয় নিজের মনের মধ্যে এই দৃশ্য সহ্য করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,—তাই হবে সর্দ্দার,—এই আশ্রমই যতক্ষণ সাধ্য তোমাদের রক্ষার ভার নেবে,—যদি অনশনক্লিষ্ট দরিদ্রের সেবা করতেই না পারল, তবে এ আশ্রমের প্রয়োজন কি ?—অসীম—অসীম—

অসীম অদূরেই দাঁড়াইয়া ছিল, ডাক শুনিয়া নিকটে আসিয়া বলিল,—কি কাকাবাবু—?

—এই সব ছেলেমেয়েরা কয়দিন খেতে পায় নি,—আশ্রম থেকে তুমি এদের সেবার ব্যবস্থা কর—

—তাই হবে কাকাবাবু—কিন্তু—

বিশ্বপতি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,— কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবসর নাই, অসীম ! যদি প্রয়োজন হয়, তবে এদের জন্য ভিক্ষা করেও অন্ন সংগ্রহ করতে হবে—

একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন,—এই গরীবদের গায়ের রক্ত জল-করা পয়সায়—একটা ধর্ম্মঘটের তহবিলও হয়েছিল। কিন্তু

এদের প্রয়োজনের সময় সে অর্থের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—

অসীম একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—শুনেছি, জ্যাঠামশায় আর বিনোদ বাবুর উপর তার ভার ছিল—

বিশ্বপতির মুখে বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, গরীবের অর্থ ধনীরা এই ভাবেই শোষণ করে! অথচ এই অশিক্ষিত, অনশনক্লিষ্ট হতভাগাদের প্রতারণা করার মত পাপ বোধ হয় দুনিয়ায় আর নেই—!

কয়েকজন লোক কারখানার দিক হইতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। বিশ্বপতি ও অসীমের নিকটে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহারা বলিল,—কারখানার সম্মুখে ভয়ানক দাঙ্গা বেধে গেছে বাবুজী,—বোধ হয় এতক্ষণে অনেক লোক খুন জখম হয়ে গেল—

বিশ্বপতি ও অসীম উভয়েই উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অ্যাঁ,—কি হয়েছে, শীগ্‌গীর বল—শীগ্‌গীর বল—

উত্তরে আগন্তুকেরা যাহা বলিল,—তাহার মর্ম্ম এই যে, কতকগুলি পাহাড়ী কুলী ধর্ম্মঘটীদের দল ছাড়িয়া কারখানার ভিতরে কাজ করিতে যাইতেছিল। ধর্ম্মঘটীরা তাহাদের পথ রোধ করাতে তাহারা 'কুকরী' বাহির করিয়া আক্রমণ করে;—সঙ্গে সঙ্গে কারখানার কতকগুলি ভোজপুরী জমাদার লাঠী হাতে বাহির হইয়া আসিয়া পাহাড়ী কুলীদের দলে যোগ দেয়। ফলে দুই পক্ষে ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। কয়েক জনের মাথা ফাটিয়াছে—এতক্ষণ কত লোক খুন জখম হইয়াছে বলা যায় না—!

বিশ্বপতি ও অসীম উভয়েই কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া

রহিলেন। অবশেষে বিশ্বপতি কহিলেন,—অসীম, আমি চললাম, দেখি এই নরহত্যা নিবারণ করা যায় কিনা! তুমি এদের দেখ—

বলিয়া তিনি কারখানার দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন। অসীম তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—না, কাকাবাবু, আপনার সেখানে যাওয়া হতে পারে না,—আপনি বরং এই অতিথিদের সেবার ব্যবস্থা করুন—আমিই দেখে আসি—

বিশ্বপতি সবিস্ময়ে কহিলেন,—সে কি তুমি!—তুমি ছেলেমানুষ, সেই দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে কি করবে? না—না, সে হতে পারে না, আমিই যাব—

অসীম সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল,—কাকাবাবু, আপনার আদেশ, দেবতার আদেশের মতই আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আজ আপনার এই আদেশ লঙ্ঘন করাই আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আপনাকে কিছুতেই আমি সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যেতে দেব না।···আমার জন্য কোন ভাবনার কারণ নেই, আত্মরক্ষায় আমি সম্পূর্ণ সক্ষম—

বলিয়া অসীম আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া দ্রুতবেগে কারখানার দিকে ছুটিল।

বিশ্বপতি কিছুক্ষণ তাহার গমনপথের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলিলেন,—নারায়ণ—নারায়ণ! আজকালকার ছেলেরা কি জেদী! গুরুজনের কথা একেবারে মান্‌তে চায় না। আমি এখন ওর কাকীমাকে কি বলি! সে যখন বলবে—তুমি বুড়ো

মানুষ নিরাপদে ঘরে বসে রইলে, আর বিপদের মুখে পাঠালে আমার ছেলেকে, তখন আমি কি উত্তর দেব ?

কিন্তু বেশীক্ষণ এই চিন্তা করিবার অবসর তাঁহার হইল না,—আশ্রমপ্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েদের করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, তাঁহার মাথার উপরে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে !

সমস্ত রাত্রি গণপতির ভাল করিয়া জ্ঞান হইল না। সবিতা সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে পিতার শিয়রে বসিয়া রহিল। গণপতি অর্দ্ধচেতন অবস্থায় মাঝে মাঝে বিনোদ ও সুপ্রভা সম্বন্ধে যে সব প্রলাপ বকিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া সবিতা বিস্মিত চমকিত হইল। এ কি শুধু বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের প্রলাপ, অথবা ইহার মূলে কোন সত্য আছে? বাবা সত্যই কি……? সবিতার মন একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না। সম্মুখের দেয়ালে টাঙ্গানো মায়ের ছবির দিকে চাহিয়া সবিতার বোধ হইল, যেন সে মূর্ত্তি অত্যন্ত বিষণ্ণ, করুণ, একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার মধ্য দিয়া যেন আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে! সবিতা অল্প বয়সেই মাতৃহীনা, পিতার ক্রোড়েই সে মানুষ হইয়াছে। মায়ের যে-স্মৃতি তাহার অন্তরে আছে, তাহাতে তিনি অপার স্নেহশালিনী, করুণাময়ী রূপেই চিত্রিত। কিন্তু মায়ের মুখে কোন দিন হাসি দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। তিনি ফুলের মতই কোমল, সুন্দর ছিলেন, —অন্তরের কি এক নিগূঢ় প্রদাহে নিদাঘতাপক্লিষ্ট ফুলের মতই তিনি অকালে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িলেন।……মায়ের মনে যে একটা গভীর বেদনা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বড় হইয়া সবিতা সে বেদনার কারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে;—কিন্তু পারে নাই। আজ সহসা তাহার মনে সংশয় আসিল—বাবার সঙ্গে মায়ের কি অন্তরের যোগ ছিল না? যে প্রেমের প্রয়াগ-

সঙ্গমে স্নান করিয়া নরনারী ধন্য হয়, পবিত্র হয়,—তাঁহারা কি তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন?···সবিতা ভাবিয়া কোন কুল কিনারা পাইল না!

শেষ রাত্রে গণপতি ঘুমাইয়া পড়িলেন। সবিতা তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, কিন্তু তাহার চোখে আর ঘুম আসিল না।

একটু বেলা হইলে পিতার ঘরে সবিতার ডাক পড়িল। গণপতি তখন বেশ সুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল দেহে একটু দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছেন।

সম্মুখের একখানি আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গণপতি কহিলেন,—বস মা, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

সবিতা বসিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বহুক্ষণ কাটিয়া গেল,—গণপতি কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না। বোধ হয় তাঁহার অন্তরে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল!

অবশেষে তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—মা, সবিতা, তোর বাবা একটা নরাধম, পাষণ্ড,—এ কথা জান্‌লেও কি তুই তাকে শ্রদ্ধা করতে পারবি—?

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—তুমি এমন যা তা বল্‌লে, আমি শুনবো না, বাবা, তোমার মন এখনও স্থির হয়নি। ওই বিনোদ বাবু লোকটাকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে, ওকে আর কোন দিন এ বাড়ীতে ঢুকতে দেব না—

গণপতি ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—ও নিজেই আর কোন দিন এ বাড়ীতে আসবে না—হয়ত এদেশ ছেড়েই চলে যাবে—

কেন বাবা,—দেশ ছেড়ে চলে যাবে কেন, কি হয়েছে তার—?

গণপতি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্লান্তস্বরে বলিলেন,—সেই কথাই তো বলবো বলে তোকে ডেকেছি। কিন্তু বিনোদ বাবুর কোন দোষ নাই—দোষ সম্পূর্ণ আমার। আমিই তাদের কাছে গুরুতর অপরাধ করেছি—তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! আমার মত মহাপাপী আর নেই—!

সবিতা গম্ভীরভাবে বলিল,—বাবা, সেই ওষুধটা তোমাকে আর একবার খেতে হবে, স্নানের ব্যবস্থাও করে দিই। স্নান করে তুমি আর একটু ঘুমোও—নইলে তোমার মন স্থির হবে না—

গণপতি ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—আমার মন খুবই স্থির আছে, সেজন্য তোর কোন ভাবনা নেই!···

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, সহসা দেয়ালে টাঙ্গানো মৃত পত্নীর ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন,—কাল উনি ছবি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, আমাকে তিরস্কার করবার জন্য—

সবিতার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলিল,—বাবা—বাবা—চুপ কর তুমি—আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনে—

এই বলিয়া সবিতা আসন ছাড়িয়া উঠিতে উদ্যত হইল।

গণপতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—না—না, তুই যাস্‌নে, তোকে

সে কথা না বলে আমার নিস্তার নেই, মনের এই পাষাণ ভার নইলে কিছুতেই নামবে না !

সবিতা নিতান্ত নিরুপায় ভাবে আবার বসিয়া পড়িল।

গণপতি অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—বিনোদ দেশ ছেড়ে যাবে কেন জানিস্ ?

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।

—আমি তাকে এক লাখ টাকার একখানা চেক দিয়েছি—

এই বলিয়া গণপতি চেকের মুড়িটা সবিতার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলেন।

সবিতা এবার চমকিত, এমন কি ভীত হইল। তাহার পিতার কি সত্যই মস্তিষ্কবিকৃতির সূচনা হইয়াছে ! প্রকাশ্যে বলিল,—বাবা, তুমি ওই হতভাগাকে এক লাখ টাকার চেক দিতে গেলে কেন ? ও নিশ্চয়ই তোমাকে যাদু করেছিল ! আমি এখনই ব্যারিষ্টার মিঃ চৌধুরীকে টেলিফোন করছি—

গণপতি উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—চৌধুরীকে টেলিফোন করতে হবে না, সে এখনই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলবে, আর আমার কলঙ্ক দেশময় ভাল করে রটনা হবে !

তারপর সবিতার মুখের উপর দুই চক্ষুর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—চেক না দিলে, আমার নামে ও তার স্ত্রী সুপ্রভার নামে ডাইভোর্সের মোকদ্দমা সে আনত। আমি তো রসাতলে যেতামই, একজন নিরপরাধিনী ভদ্র মহিলার সর্ব্বনাশ হত—

সবিতা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত মুহ্যমান হইয়া রহিল। কোন কিছু

চিন্তা করার পর্য্যন্ত শক্তি যেন তাহার লোপ পাইল। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—বাবা, আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি নে! বিনোদবাবু ডাইভোর্সের মোকদ্দমায় তোমাকে আসামী করতে যাবে কেন? তুমি কি করেছ? সেই ভণ্ড প্রতারক নিশ্চয়ই তোমার নামে একটা কিছু মিথ্যা ষড়যন্ত্র করেছে!

গণপতি ক্লান্তস্বরে বলিলেন,—যদি একেবারে মিথ্যা হত, তা হলে তো বাঁচতেম। কিন্তু কথাটা তো একেবারে মিথ্যা নয়, মা! তোর বাবা মনে মনে মহা অপরাধ করেছে, সুপ্রভা আমারই জন্য স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তোর কাছে এসব কথা বলতে লজ্জায় ঘৃণায় আমার মাথা যে কাটা যাচ্ছে, মা—

বলিয়া গণপতি বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সংজ্ঞাশূন্যবৎ পড়িয়া রহিলেন।

সবিতা ধীরে ধীরে পিতার শয্যার পার্শ্বে যাইয়া বসিল এবং তাঁহার মাথায় জননীর ন্যায় পরম স্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল।

এই ভাবে পিতা পুত্রী দুইজনেই নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের উভয়ের অন্তরে যে বেদনার প্রবাহ চলিতেছিল, তাহা প্রকাশ করিবার অন্য কোন ভাষা বুঝি ছিল না!

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সবিতা কি যেন বলিতে যাইতেছিল,—এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সবিতা তাড়াতাড়ি গিয়া টেলিফোন ধরিল। গণপতি উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে সবিতা ফিরিয়া

আসিয়া কহিল,—মায়াপুরের কারখানার ম্যানেজার টেলিফোন করছেন,—কারখানার সম্মুখে ধর্ম্মঘটের ফলে মজুরদের মধ্যে বিষম দাঙ্গা বেধে গেছে, দুই চারটা খুন জখমও হয়েছে; ম্যানেজার বলছেন, তোমার কথাতেই মজুরেরা ধর্ম্মঘট করেছে, সুতরাং তুমি না গেলে কেউ তাদের থামাতে পারবে না—।

—ম্যানেজার এই কথা বললেন,—আমি না গেলে দাঙ্গা থামবে না ?—

—হাঁ, বাবা, তিনি তো তাই বললেন।

—তবে বল্, আমি এখনই যাচ্ছি—!

সবিতা কয়েক মুহূর্ত্ত অবাক হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—সে কি, বাবা ! তোমার এই শরীর নিয়ে—

গণপতি অবিচলিত স্বরে কহিলেন,—চুলোয় যাক শরীর ! আমিই যখন এই ধর্ম্মঘটের সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন এ বন্ধ করবার দায়িত্ব আমারই,—নইলে আমার পাপের বোঝা আরও ভারী হবে ! তুই বল্ সবিতা, আমি এখনই যাচ্ছি—

সবিতা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ধীরে ধীরে টেলিফোনের নিকটে গিয়া সেইরূপ উত্তরই দিল। ফিরিয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি কি সত্যই যাবে, বাবা—?

—সত্যই যাব,—না গিয়ে আমার উপায় নেই—

সবিতা কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল,—তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব—!

—সে কি মা, তুই সেই দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনজখমের ভিতরে

যাবি কি করে! ওদের কি আর কাণ্ডজ্ঞান আছে যে মেয়ে বলে তোকে সম্মান করবে—

—তা হোক, তাদের কাছে কোন সম্মান আমি চাই নে। এই রুগ্ন শরীর নিয়ে দাঙ্গার মধ্যে যাওয়া তোমার যদি দায়িত্ব হয়,—তবে তোমার সঙ্গে যাওয়া আমারও দায়িত্ব—

গণপতি উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন,—আমার কথা শোন, মা,—তোমার আর গিয়ে কাজ নেই,—আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো—

সবিতা কোন কথা বলিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে জানাইল যে সে যাইবেই!

গণপতি তাঁহার এই কন্যাটীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন; বুঝিলেন,—সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে এই সঙ্কল্প হইতে আর বিচ্যুত করা যাইবে না। অবশেষে হতাশ ভাবে বলিলেন,—তবে তুইও চল!···কিন্তু কি যে হবে, কে জানে!

সমস্ত রাত্রি সুপ্রভার নিদ্রা হইল না। সেই নোংরা বস্তী, খোলার ঘর, মাটীর দেয়াল, গৃহের ভিতর একটা কেরাসিনের ডিবা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহাও আবার কখনও বা দমকা বাতাসে গতাসু হইবার উপক্রম করিতেছে। তারপর সম্পূর্ণ একাকিনী সে, যদি কোন বিপদ ঘটে. কোন দস্যু এই সুযোগ লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে! হঠাৎ একবার তাঁহার মনে হইল, কে যেন বাহিরের দিক হইতে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতেছে। সুপ্রভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দরজার নিকটে গিয়া অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিল,—কই কিছুই না, বোধ হয় বাতাসের শব্দ—! ছি, তাহার এত ভয়!

গণপতি বলিয়াছিলেন বটে যে, এই নোংরা বস্তীতে এই গৃহে, সে একাকী থাকিতে পারিবে না, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা!

গণপতির কথা মনে হইতেই সুপ্রভার সর্ব্বশরীর লজ্জায় ঘৃণায় কাঁটা দিয়া উঠিল। গণপতির আশ্রয়ে সুপ্রভা কখনই যাইবে না, তাঁহার এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে সে কিছুতেই পা দিবে না। গণপতি কখনই লোক ভাল নহেন,—তাঁহার সমস্ত কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী আচরণের মধ্য দিয়া কেমন একটা কদর্য্য কুৎসিত ভাব, লালসার ছবি সে যেন ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছে,—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হইলেও, তাহা সুপ্রভার দৃষ্টি এড়ায় নাই।...

ভাবিতে ভাবিতে শেষরাত্রে সুপ্রভা তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে দুঃস্বপ্ন দেখিল যে, একটা কালো ছায়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে ভীষণ দৈত্যের আকার ধারণ করিল এবং তাহাকেই আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন এই কালো ছায়াকেই সে মায়াপুরের ডাকবাংলাতে রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিল! সেই তাহার বীভৎস মূর্ত্তি, ক্লেদপঙ্কিল হস্ত, লোলজিহ্বা! তাহার মুখের চেহারা অনেকটা গণপতিরই মত! ওই হাতে সে যদি সুপ্রভাকে স্পর্শ করে, যদি লোলজিহ্বা দিয়া তাহার বুকের রক্ত শোষণ করে! সুপ্রভা ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিল, তাহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, বুক ধড়ফড় করিতেছে,—প্রভাতের রৌদ্র জানালা দিয়া আসিয়া তাহার শয্যার উপরে পড়িয়াছে।

জানলার দিকে চাহিতে তাহার চোখে পড়িল—একখানি পত্র নীচে মেজের উপর পড়িয়া আছে। কাহার এ পত্র, তাহার? কে লিখিয়াছে? গণপতি? সুপ্রভা শয্যা হইতে উঠিয়া পত্রখানি তুলিয়া লইল! এ কি! কাহার এ হস্তাক্ষর! সুপ্রভার হাত কাঁপিতে লাগিল, পত্রখানি হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

সুপ্রভা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে মন দৃঢ় করিয়া অকম্পিত হস্তে পত্রখানি পুনরায় তুলিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে তাহা খুলিয়া পড়িল,—

আমি চিরদিনের মত এদেশ ছাড়িয়া আমেরিকায় যাইতেছি।

তোমার উপর স্বামিত্বের সমস্ত দাবী ত্যাগ করিলাম। আশা করি, তুমি সুখী হইবে।

বিনোদ

সহসা আকাশের বজ্র যেন সুপ্রভার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। সে পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ সে সংসারে নিতান্ত নিঃস্ব, অসহায়, সর্ব্বহারা,—আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই, কোথায়ও তাহার আশ্রয় নাই! সমাজের চক্ষে সে ঘৃণ্য পতিত, নারীত্বের যেটুকু তেজ তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বুঝি আজ বিলুপ্ত হইল! যে-কথা এতদিন তাহাদের নিজের মনেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তাহা জগতের হাটে প্রচারিত হইবে!

সুপ্রভা অসাড় নিষ্পন্দ হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিল। এই ভাবে সমস্ত দিন অতীত হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তড়িতস্পৃষ্ট-বৎ সে উঠিয়া বসিল। আজই এই সময়েই তো গণপতির আসিবার কথা! এখনই হয়ত সে আসিয়া পড়িবে। না,—আর এক মুহূর্ত্ত সুপ্রভা এখানে থাকিবে না,—কালান্তক যমের মতই গণপতির কল্পনা এখন তাহার কাছে ভয়ঙ্কর! এই গৃহ ছাড়িয়া তাহাকে পলাইতে হইবে,—পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়াও যদি গণপতির হাত এড়ানো যায়, তাহাই সে করিবে। সুপ্রভা একবস্ত্রে ছুটিয়া গৃহের বাহির হইল এবং দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল। মোড়ের মাথায় একখানা মোটর গাড়ী আসিতেছিল। সুপ্রভার মনে হইল, ওই বুঝি

গণপতির গাড়ী, সে আরও প্রাণপণ বেগে ছুটিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে, পথের মোড়ে মোড়ে গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, লোকে ব্যস্তভাবে যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। সুপ্রভার দিকে কেহই বড় একটা লক্ষ্য করিল না। যাহারা লক্ষ্য করিল,—তাহারা তাহার উদ্ভ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবিল, এ কোন পাগলিনী হইবে।

এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে সে গঙ্গার ধারে হাওড়ার সেতুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গঙ্গার শীতল সমীরণ তাহার উত্তপ্ত ললাটে স্নেহস্পর্শ বুলাইতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু যাহার অন্তরে আগুন জ্বলিতেছে, বাহিরের স্নিগ্ধতা তাহার কি করিবে?

সুপ্রভা অন্যমনস্কভাবে সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—কাতারে কাতারে লোক সেতু পার হইয়া হাওড়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে। তাহাদের অনেকের হাতেই ছোট বড় পুটলী, খাবারের বাক্স বা ঐ জাতীয় কিছু। ইহারা বোধ হয় সারাদিনের কর্ম্মক্লান্তির পর গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, সেখানে ইহাদের সেবাপরায়ণা পত্নী, আদরের পুত্রকন্যা ইহাদের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে! তাহার মত সর্ব্বহারা হতভাগিনী তো কেহই নহে! মাঝে মাঝে গাড়ীতে চড়িয়া মেয়েরা তাহাদের স্বামী, পুত্র বা ভ্রাতার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে! কি স্নিগ্ধ মধুর ইহাদের হাসি,—মন কি নির্ম্মল আনন্দে ভরপূর! উহাদের ঐ আনন্দের এক কণাও যদি সুপ্রভা পাইত!

এমনই কত কি ভাবিতে ভাবিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই

সুপ্রভা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা, লোকজনের কোলাহল, চীৎকার, ছুটাছুটি! যাত্রার আনন্দে সকলেই যেন অধীর! সুপ্রভা কোথায় যাইবে? তাহার তো যাইবার স্থান নাই, উপায়ও নাই,—সে কপর্দ্দক শূন্য, নিঃস্ব ভিখারিণী। তবু সে ভূতাবিষ্টবৎ অন্য সকলের সঙ্গে প্লাটফর্ম্মের দিকে চলিতে লাগিল, বন্যাস্রোতের সঙ্গে যেমন তৃণ ভাসিয়া চলে, লোকস্রোতের সঙ্গে সেও তেমনি ভাসিয়া চলিল। স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হয় ফটকের নিকটে কেহ তাহাকে বাধা দিল না। ফটক পার হইয়া সে প্লাটফর্ম্মে গিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—কাশীযাত্রী গাড়ী। যাত্রীরা ব্যস্ত সমস্তভাবে মালপত্র লইয়া উঠিতে লাগিল। সুপ্রভা উদাস দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। সে নিজে কোথায় যাইবে, কিরূপে যাইবে, সে চিন্তা একবারও তাহার মনে আসিল না। অবশেষে গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল। প্লাটফর্ম্মে যে-সব যাত্রী দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেই তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। কেবল সুপ্রভা পূর্ব্ববৎ নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট। একজন রেলের কুলী তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—মাইজী জলদী ওঠ, জল্দী,—এখনই গাড়ী ছাড়বে,—বলিয়া সে সম্মুখের মেয়েদের গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। সুপ্রভা যন্ত্রচালিতবৎ বিনাবাক্যব্যয়ে সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পর মুহূর্ত্তেই গাড়ী চলিতে লাগিল।

* * * *

গণপতির মোটর মায়াপুর কারখানা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে থামিতে বাধ্য হইল। সম্মুখে আর যাইবার পথ নাই, লোকের ভীড়ে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই উত্তেজিত জনসঙ্ঘ দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহারা জ্ঞানশূন্যবৎ চীৎকার, গর্জ্জন কোলাহল ছুটাছুটি করিতেছে,—কেন করিতেছে, তাহারা হয়ত নিজেও ভাল জানে না! অনেকের হাতেই কোন না কোন একটা অস্ত্র,—লাঠি, লোহার ডাণ্ডা, কারখানার বড় বড় কাঠের চেলা!—যে আর কিছু পায় নাই, সেও একখানা ইট বা পাথর রাস্তার ধার হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাই হাতে করিয়া প্রাণপণ বেগে সম্মুখের দিকে ছুটিতেছে। সকলেরই মুখে "মার—মার—" শব্দ।

গণপতি কিছুক্ষণ সেই বিশাল লোকারণ্যের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন,—এর মধ্যে কেবল ধর্ম্মঘটকারী মজুরের দলই নাই;—দাঙ্গার গন্ধ পাইয়া ঐ অঞ্চলে যত ভবঘুরে গুণ্ডা বদমায়েস ছিল, সকলে আসিয়া জুটিয়াছে,—ঘূর্ণীবায়ুর মধ্যে যেমন করিয়া চারিদিক হইতে তৃণপত্র জঞ্জালরাশি ছুটিয়া আসে!

গণপতির মোটর দেখিয়া ভীড়ের মধ্য হইতে বহু লোক আসিয়া মোটর ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দুই চারজন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"রুদ্র সাহেব—রুদ্র সাহেব—"! অমনি ভীড়ের মধ্যে চারিদিক হইতে রব উঠিল—"রুদ্র সাহেব

—রুদ্র সাহেব" এবং সেই শব্দ লোকারণ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই আলোড়নের ফলে মোটরের রাস্তা একটু পরিষ্কার হইল এবং ড্রাইভার সেই সুযোগে গাড়ীখানি সম্মুখের দিকে চালাইয়া দিল। বিক্ষুব্ধ জনতা অস্ত্রশস্ত্র আস্ফালন করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ "মার-মার" শব্দে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গণপতি ধীর, স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর,—এই উত্তেজিত জনসঙ্ঘের বিক্ষোভে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সবিতা এ দৃশ্য দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল, তাহার মনে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিষম আশঙ্কা জাগিতে লাগিল। অবশেষে সে কহিল,—বাবা, আর এগিয়ে কাজ নেই, ওরা হয়ত কি একটা করে বস্‌বে—

গণপতি কোন উত্তর দিলেন না, শুধু ম্লান হাসিয়া ড্রাইভারকে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু মোটর আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। যেখানে আসল যুদ্ধের কেন্দ্র, দুই পক্ষের সেনাপতিরা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, গণপতির গাড়ী সেইখানে আসিয়া থামিয়া গেল। এবার তাহার পথ সম্মুখে পশ্চাতে সব দিকেই রুদ্ধ হইল।

সবিতা সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—সে এক বীভৎস নিদারুণ দৃশ্য। দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি লাঠী, লোহার ডাণ্ডা, কাঠের চেলা প্রভৃতি লইয়া নির্ম্মম ভাবে আক্রমণ করিতেছে। আঘাতের চোটে কাহারও মাথা ফাটিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িতেছে,

কেহ বা আহত হইয়া একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে। উন্মত্ত জনতার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, হুঙ্কার—আহতের আর্ত্তনাদ, কাতর ক্রন্দন, সমস্ত মিলিয়া বায়ুমণ্ডল ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইট ও পাথর বৃষ্টির তো বিরাম নাই, কখন কাহার উপরে যে তাহাদের অনুগ্রহ হইবে, তাহার ঠিকানাও নাই। একটা থান ইট আসিয়া গণপতির মোটরের উপরে পড়িল। ড্রাইভার স্কন্ধ দেশে আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, মোটরের সম্মুখের কাচখানাও ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল!

সবিতা ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু গণপতি প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে গাড়ীর দরজা খুলিয়া সেই উন্মত্ত জনতার মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। সবিতা ব্যাকুলভাবে পিছন হইতে ডাকিল,—বাবা—বাবা—নেমোনা—নেমোনা, ওই খুনীরা তোমাকে মেরে ফেলবে!—গণপতি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

নিকটেই রাস্তা মেরামত করিবার জন্য কতকগুলি ভাঙ্গা পাথর স্তূপাকার করা ছিল। দাঙ্গাকারীরা ইচ্ছামত সেগুলি সংগ্রহ করিয়া সদ্ব্যবহার করিতেছিল। সেইজন্য ইতিমধ্যেই স্তূপটীর আয়তন অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। গণপতি সেই পাথরের স্তূপের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জনতা এই নূতন দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল, পরক্ষণেই চারিদিক হইতে ভীষণ গর্জ্জন উঠিল,—রুদ্র সাহেব—রুদ্র সাহেব—!

সেই বিশাল লোকারণ্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই হাত জোড় করিয়া গণপতি বলিলেন,—ভাই সব, শান্ত হও, স্থির হও, এমন ভাবে উত্তেজিত হয়ে পরস্পর কাটাকাটি করে মরোনা!

ভেবে দেখ, এতে তোমাদেরই ক্ষতি—যারা তোমাদের শত্রু, সেই ধনিকেরা তোমাদের এই আত্মকলহ দেখে মনে মনে হাসছে। তারা জানে, এর ফলে তোমরা নিজেরাই দুর্ব্বল শক্তিহীন হয়ে পড়বে, আর তখন তারা তোমাদের সকলকেই ছারপোকার মত টিপে মেরে ফেলবে!……

মুহূর্ত্ত কাল থামিয়া গণপতি পুনরায় বলিলেন,—ভাই সব, চেয়ে দেখ, এই আত্মহত্যাকর দাঙ্গার ফলে এর মধ্যেই কতজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে,—ওদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মরেও যাবে। এ দেখেও কি তোমরা আরও দাঙ্গা করতে চাও—?

জনতা বর্ষণোন্মুখ প্রলয়ের মেঘের মত নিস্তব্ধ,—একটী নিঃশ্বাসপতনের শব্দও যেন কোথাও শোনা যাইতেছিল না।

—আমি বলি, যারা কারখানার কাজে যেতে চাইছে, তাদের যেতে দাও;—জোর করে তাদের ধরে রেখে লাভ কি! আর তোমরাও যে আজ তিনদিন ধর্ম্মঘট করে আছ, তাতেই বা কি ফল হয়েছে? ধনিকের হৃদয় তাতে বিগলিত হয় নাই, মাঝের থেকে তোমাদেরই স্ত্রীপুত্র পরিবার অনাহারে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে,—তোমরাও ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছ। এই পাষাণ দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে লাভ নেই। ওকে একদিন হয়ত প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করতে হবে, কিন্তু সে দিন এখনও আসেনি! ভাই সব, শান্ত হও, স্থির হও,—যে যার ঘরে ফিরে যাও—!

বিশাল সমুদ্রতুল্য জনতা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়াই রহিল,

তারপর দূরাগত তরঙ্গকল্লোলবৎ চারিদিকে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠিল এবং অকস্মাৎ উন্মত্ত সমুদ্রতরঙ্গেরই মত একদল লোক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া লাঠী, কাঠের চেলা, লোহার ডাণ্ডা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গণপতির দিকে ধাবিত হইল। মার—মার—নিমকহারাম বেইমানকে মার—তাহাদের মুখে কেবল এই শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

সবিতা এতক্ষণ শঙ্কাকুলচিত্তে গাড়ীতেই বসিয়াছিল। জনসমুদ্র যখন স্থিরভাবে গণপতির কথা শুনিতে লাগিল, তখন তাহার মনে একটু ভরসা হইল। কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই, এ ঝটিকার পূর্ব্বাভাস, সুতরাং যখন সেই বিশাল জনতা সহসা 'মার মার' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে উন্মত্তের মত গণপতির দিকে ধাবিত হইল,—তখন সবিতা স্তম্ভিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভীড়ের মধ্যে সে নামিয়া পড়িল এবং পিতার দিকে ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে চারিদিকেই জনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর সবিতার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সবিতা একান্ত নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—আততায়ীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হস্তে তাহার পিতার দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু গণপতি একটুও বিচলিত হইলেন না, সেই প্রস্তরস্তূপের উপর হইতে এক পদও নড়িলেন না। বুকের উপর দুই বাহু নিবদ্ধ করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন,—যেন সেই উন্মত্ত জনতার কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার বড়ই কৌতুক বোধ হইতেছিল!

জনতা গণপতির ঠিক সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, এবার আর

রক্ষা নাই! সবিতা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল! একবার ডাকিতে চেষ্টা করিল "বাবা",—কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইল না।···অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। একজন দীর্ঘকায় যুবক সেই বিশাল জনসমুদ্র মন্থন ও আলোড়ন করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহার দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলিত, যেন উত্তেজিত জনতাকে সে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে! এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে উর্দ্ধবাহু যুবক উন্মত্ত জনতার ঠিক সম্মুখে আসিয়া গণপতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া বলিল,—ভাই সব, ক্ষান্ত হও, মানুষ খুন করো না! ইনি রুদ্র সাহেব, তোমাদের নেতা, আজ তাঁকেই তোমরা খুন করতে উদ্যত হয়েছ—ছি—ছি!—

উন্মত্ত জনতা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—নেতা নয়, নেতা নয়, দুষমন বেইমান্! মার মার—!

যুবক ধীর গম্ভীর স্বরে বলিল,—তবে আমাকেই মার,—আমার মৃতদেহ অতিক্রম না করে, তোমরা ওঁর কাছে যেতে পারবে না—

একসঙ্গে কতকগুলি লাঠী ও লোহার ডাণ্ডা যুবকের মাথার উপরে উদ্যত হইল!

সবিতার চোখ দুইটা যেন ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। কে এই দীর্ঘকায় আগন্তুক? অসীম-দা নয়?···তাইত! হঠাৎ অসীম-দা কোথা হইতে আসিল!···পিতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার মাথাই যে আজ চূর্ণ হইয়া যাইবে!

সবিতা তাহার দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া জনতা ঠেলিয়া

সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবার তাহার পথ ছাড়িয়া দিল!

আর এক মুহূর্ত্ত—এক লহমা মাত্র—লোহার ডাণ্ডার আঘাতে অসীমের মাথা এখনই···সবিতা ভয়ে চোখ বুঁজিল!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়! সহসা কোথা হইতে একটী বালিকা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিয়া অসীম ও আততায়ীদের ঠিক মধ্যে দাঁড়াইল! অসীম সম্মুখের ডাণ্ডার আঘাত এড়াইবার জন্য যন্ত্র-চালিতবৎ অভ্যাসবশে মাথাটা একটু হেলাইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কতকগুলি লাঠী ও ডাণ্ডার আঘাত বালিকার মাথার উপরে গিয়া পড়িল। বালিকা রক্তাক্ত কলেবরে ছিন্নমূল লতার মত ধরাশায়ী হইল, তাহার মুখ দিয়া একটী শব্দ পর্য্যন্ত বাহির হইল না।

ব্যাপারটা কি হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতেই কয়েকটা লাঠীর আঘাত এবার অসীমেরই মাথা ও কাঁধের উপর আসিয়া পড়িল। অসীমও কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

চারিদিক হইতে লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল—ওরে কি কর্‌লি—কি কর্‌লি—একটা দুধের শিশুকে খুন কর্‌লি—নির্দ্দোষী ভাল মানুষকে মেরে ফেল্‌লি—!

যাহারা লাঠী ডাণ্ডা প্রভৃতি হাতে করিয়া পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহারা বিমূঢ়ের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, সমুদ্রতরঙ্গ যেন অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

লোকারণ্যের মধ্য হইতে "জল আন, জল আন"—বলিয়া

চীৎকার উঠিল। কতকগুলি লোক দৌড়াইয়া জল লইয়া আসিল এবং বালিকার মুখে চোখে দিতে লাগিল। কেহ কেহ জল লইয়া অসীমের দিকে ছুটিল। সবিতা পাগলিনীর মত ছুটিয়া গিয়া অসীমের দেহ কোলে লইয়া সেই জনতার মধ্যে বসিয়া পড়িল। লোকে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সম্ভ্রমে সরিয়া গেল।

গণপতি এতক্ষণ স্তূপের উপরে দাঁড়াইয়াই বিস্ময়বিমূঢ়ের মত এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবারও অবসর পান নাই। এইবার স্তূপ হইতে নামিয়া যেখানে বালিকার দেহ পড়িয়াছিল, সেই দিকে ছুটিলেন। বালিকার মাথা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে, দেহ হইতে নির্গত রক্তের স্রোতে ধরণীতল প্লাবিত হইয়াছে, দেহে প্রাণ নাই, প্রচণ্ড আঘাতে মস্তক চূর্ণ হইয়া তখনই তাহার জীবন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

গণপতির হৃদয় দুঃসহ বেদনায় আকুল হইয়া উঠিল। কে এই বালিকা—আজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল! তাহার এই ঋণের দুর্ব্বহ বোঝা কতজন্ম ধরিয়া গণপতিকে বহন করিতে হইবে! গণপতি গভীর শোকার্ত্ত হৃদয়ে বালিকার মৃতদেহের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন।

দুই সপ্তাহ পরের কথা। আশ্রমের ভিতরের দিকে একটা ঘরে অতুল কাগজ কলম লইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তাহারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মাধুরী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

ইহারা দুইজন দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিয়া কয়েকদিন হইল আসিয়াছে।

মাধুরী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল,—ওগো, কবি, তোমার ধ্যান কি আজ আর ভাঙ্গবে না? সেই সকাল থেকে কাগজ কলম নিয়ে কি সব মাথামুণ্ড লিখছ,—এখনও কি তার শেষ হ'ল না?

অতুল ঘাড় ফিরাইয়া কৃত্রিম কোপের ভঙ্গীতে কহিল,—আঃ! কবির ভাগ্যে যদি অকবি গৃহিণী জুটে, তবে তার দুর্দ্দশা এমনই হয় বটে! আমি সকাল থেকে বহু তপস্যা ক'রে দেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করেছি, তিনিও মরালবাহনে আমার মনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর আমি সেই সুযোগে একটা যুগান্তকারী কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছি,—এমন সময় তুমি এসে কাংস্যকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—

মাধুরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—কি আমার কাংস্যকণ্ঠ?

—আহা চটো কেন? না হয়, তোমার কণ্ঠস্বর এসরাজের মতই মধুর! কিন্তু তুমি আমার ধ্যানভঙ্গ ক'রে, কবিতাটা—

—কি এমন মহাকবিতা রচনা ক'রছ তুমি—যার অভাবে জগতের ঘোর অনিষ্ট হবে—!

অতুল গম্ভীর ভাবে বলিল,—এবার যথার্থই একটা কবিতার মত কবিতা রচনা করেছি, এমন জিনিষ আমার কলমের মুখে আর কখন বেরোয়নি! এতদিন দুঃখের মধ্যে কোন আনন্দের সন্ধান পাইনি. রুদ্রকে, ভীষণকে ভাবতেই ভয়ে শিউরে উঠেছি। কিন্তু আজ বুঝেছি, দুঃখের মধ্যে, আত্মোৎসর্গের মধ্যে, কি পরমানন্দ! করালীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির মধ্যেও কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! সে দিন যে বালিকা দুঃখ-দেবতার পায়ে নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে ধ্বংস-যজ্ঞ নিবারণ ক'রল, তার প্রেমের কি তুলনা আছে? কবির কাব্য তার জয়গান গেয়ে শেষ করতে পারে না!

—শান্তির কথা বলছ তুমি, আহা কি নিদারুণ মৃত্যু তার—!

কিন্তু মাধুরী, আমি মনে করি তার জীবনের চেয়ে মৃত্যুই বেশী গৌরবের! তার শবদেহ নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকেরা যে বিরাট শোভাযাত্রা করল, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী কোন রাণীরও বোধ হয় তেমন সম্মান হয়নি! যারা মারামারি কাটাকাটি করে মরছিল, এক নিমেষে তারা তাদের বিরোধ ভুলে গেল, আত্মদানের রক্তে ঈর্ষাবিদ্বেষের জ্বালা শান্ত হল! এমন অদ্ভুত ব্যাপার তুমি আর কখন দেখেছ কি—?

মাধুরী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল,—দেখেছি। নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মানুষ যে অনাহারে অনিদ্রায় দিনরাত সেবা করতে পারে, পূর্ব্বে তা কোন দিন দেখিনি! সবিতার মধ্যে সেই মূর্ত্তিমতী সেবাকেই আমি প্রত্যক্ষ করেছি;—সেও এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার!

অতুল গদগদস্বরে বলিল,—হাঁ আমিও তা দেখেছি। সবিতা মানবী নয়, দেবী,—সে না থাকলে অসীমকে কেউ বাঁচাতে পারত না—!

মাধুরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—প্রথম কয়েক দিন তো জ্ঞানই ছিল না, সেদিন আমাকে দেখে চিন্‌তে পেরে বললেন,—বন্ধু, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে, জীবনে যে সব ভুল করেছি, এই মৃত্যুর দ্বারে এসে তা সংশোধন করতে চাই—

সবিতা তাঁর মাথায় বরফের পুঁটলী লাগাইতেছিল। মৃদু হাসিয়া বলিল,—ভুল সংশোধনের জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? মানুষেই ভুল ক'রে থাকে,—যে কোন দিন জীবনে কোন ভুল করেনি, সে হয় নির্ম্মম দেবতা, নয় হৃদয়হীন যন্ত্র—!

অতুল কোন কথা না বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে মাধুরীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল,—আলেয়ার পিছনে ছুটে ভুল আমিও করেছিলাম মাধুরী, বড়ই মারাত্মক ভুল! কিন্তু দুঃখের বজ্রালোকে তা ধরা পড়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে, মাধুরী!

মাধুরী কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার ক্ষমাসুন্দর প্রসন্ন দৃষ্টি বলিয়া দিল, চাহিবার পূর্ব্বেই অতুল ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিয়াছে! মাধুরীকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া সে তাহার অধরে একটী চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। লজ্জার আনন্দে মাধুরীর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল!

এমন সময় বাহির হইতে নারী কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—মাধুরী—মাধুরী—

তাড়াতাড়ি নিজেকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া মাধুরী বলিল,—যাই,—কাকীমা ডাকছেন—

*   *   *   *

ওদিকে আশ্রমের বাহিরের আঙ্গিনায় বসিয়া গণপতি ও বিশ্বপতি দুই বন্ধুতে বিষম তর্ক জুড়িয়া দিয়াছিলেন। গণপতি বলিতেছিলেন যে, দেনার দায়ে নীলাম করিয়া তিনি বিশ্বপতির যে ভদ্রাসন বাড়ী কিনিয়া লইয়াছেন,—বিশ্বপতিকে তাহা ফিরাইয়া লইতে হইবে। বিশ্বপতি বলিতেছিলেন যে, ঋণ তিনি শোধ করিতে বাধ্য, অতএব ঐ বাড়ী তিনি ফিরাইয়া লইতে পারেন না।

অবশেষে গণপতি বলিলেন,—বন্ধু, তুমি আমাকে অপরাধী করে রেখে চিরজীবন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করো না। একদিন নেতৃত্বের ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার মোহে, ঈর্ষাবিদ্বেষের জ্বালায় যা করেছি, তার কি ক্ষমা নাই ? তুমি মহৎ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর—

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—তোমার উপর তো রাগ করিনি, বন্ধু,—সুতরাং ক্ষমা করবার অবসর কোথায় ? তবে আমার যা নয়, তা নিয়ে আমি অপরাধী হতে চাই নে—

—বেশ, বন্ধুর স্নেহের উপহার বলে গ্রহণ কর !

বিশ্বপতি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—শোন, গণপতি, আমি যে নিঃস্ব সর্ব্বহারাদের সেবার ভার নিয়েছি, তাদেরই মত নিঃস্ব সর্ব্বহারা আমি হতে চাই। এই গৃহ, সম্পত্তি আমার পক্ষে বন্ধন,—সে বন্ধন থেকে যখন একবার মুক্তিলাভ করেছি,—আর তা যেচে গলায় পরবো না—!

গণপতি নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। তারপর সহসা বিশ্বপতির

হাত ধরিয়া সাগ্রহে কহিলেন,—বিশ্বপতি, আমি জানি, তুমি চিরকালের জেদী, আমার কথা শুনবে না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ যদি রাখ—

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গণপতির দিকে চাহিলেন।

গণপতি কহিতে লাগিলেন—অনেকদিন থেকেই ভাবছি—আমাদের আজীবনের বন্ধুত্ব নিবিড় প্রীতির বন্ধনে চিরস্থায়ী করে রাখবো। আমার মেয়ে সবিতা মনে প্রাণে তোমারই শিষ্যা,—তাকে যদি তুমি অসীমের বধূরূপে নাও—

বিশ্বপতি ঈষৎ বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে গণপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—সবিতাকে পুত্রবধূরূপে পাওয়া আমার মত ভিখারীর পক্ষে যেমন আনন্দ, তেমনি উদ্বেগের কথা! লক্ষ্মীকে গৃহে আবাহন করবার ক্ষমতা আমার কোথায়? তাছাড়া, তুমি তো জান, অসীমকে চিরদিন আমি স্বাধীনভাবেই মানুষ করেছি,—তার উপরে কোন দিক দিয়েই নিজের ইচ্ছা চাপাতে চাই নি—

—ওরা দুজন ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরকে ভালবাসে—!

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—এ কয়দিনের ঘটনায় সে ভালবাসা আরও বেশী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বন্ধু, একটা কথা ভেবে দেখেছ কি? অসীম তো ধনীর ছেলে নয়, নিজেও দারিদ্র্যকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করেছে! ধনীর দুলালী সবিতা কি তার গৃহিণী হয়ে সুখী হতে পারবে? বাস্তবজীবনে প্রেমের মোহই তো একমাত্র জিনিষ নয়, বন্ধু—যদি তার পিছনে কোন বড় আদর্শ না থাকে—!

গণপতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সবিতা ধনীর

দুলালী ছিল বটে, কিন্তু চিরকালই কি আর তাই থাকবে? ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব তাকে যেমন কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি, দারিদ্র্যের দুঃখও সে তেমনি সহজভাবে গ্রহণ করবে,—এ বিশ্বাস আমার আছে।

বিশ্বপতি কহিলেন,—আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি আমি দুজনেই যে সেকেলে হয়ে পড়েছি!—একালের তরুণদের মন আমরা জানবো কি করে? আমাদের সব জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে, তারা হয়ত নিজেদের পথই বেছে নেবে—!

গণপতি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—তাই হয়ত হবে! কিন্তু আমি যে জীবনের কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি ছুটী নিতে চাই, বন্ধু! এতদিন নেতৃত্ব, ক্ষমতা, যশ, প্রতিষ্ঠার মোহে ছুটাছুটি করেছি। আজ বুঝেছি, ঐশ্বর্য্য পদগৌরবের মোহের চেয়ে সে মোহ কিছুমাত্র কম নয়, বরং তার আকর্ষণ বেশী। তোমার মত বন্ধুর সঙ্গেও তার জন্য লড়াই করেছি, দেশের অকল্যাণ ডেকে এনেছি। আজ এসব থেকে দূরে সরে শেষ কটা দিন কাটাতে চাই—!

গণপতি থামিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—তোমার কাছে কোন কথা গোপন করবো না! একটী নিরপরাধিনী নারীর প্রতি আমি যে ঘোর অন্যায় করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত না করতে পারলে, শান্তিতে মরতে পারবো না! কিন্তু এই লোকারণ্যের মধ্যে কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল,—কে তার সন্ধান দেবে—!

বিশ্বপতি কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে গণপতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—আমার পরামর্শ যদি শোন, বন্ধু,—বৃথা আর তাকে অন্বেষণ করো না! তোমার ভয়ে সমাজ সংসার সব ত্যাগ করে সে আত্মগোপন করেছে। এইবার তোমার চিন্তার বন্ধন থেকেও তাকে মুক্তি দাও। এই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—!

গণপতির মুখ ম্লান হইয়া গেল, নতশিরে অপরাধীর মত তিনি বসিয়া রহিলেন।

অসীম সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও অনেকটা বল পাইয়াছে, কিন্তু এখনও সে ভাল করিয়া উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে না। তাহার মাথায় যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা শুকাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কাঁধে, কোমরে, হাঁটুতে যে লাঠীর চোট লাগিয়াছিল, তাহার বেদনা এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। চিকিৎসকের নির্দ্দেশমত তাহাকে অধিকাংশ সময়েই শয্যায় শুইয়া কাটাইতে হইত। সবিতা প্রায় সময়েই তাহার কাছে বসিয়া থাকিত, গল্প করিত, নানারূপ ভাল ভাল বই পড়িয়া শোনাইত। অনেক সময় তাহার নিজের স্নানাহার পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিত না। শেষে মাধুরী আসিয়া জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিত।

সবিতা উঠিতে আপত্তি করিলে, মাধুরী মৃদু হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিত,—ভয় নেই, তোর জিনিষ আমি চুরি করবো না, আমার আর যে দোষই থাক, বিশ্বাসঘাতকতা করার অভ্যাস নেই—

সবিতা রাগ করিয়া বলিত,—তোর ছেলেমানুষী আর কোন দিন যাবে না। যতই বয়স বাড়ছে, দিন দিন লজ্জা সরমের মাথা খাচ্ছিস্—

বলিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইত।

সেদিন দুপুর বেলায় অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল। সবিতা বসিয়া অসীমকে বাতাস করিতেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের একটা

নূতন লেখা পড়িয়া শুনাইতেছিল। অসীম চোখ বুঁজিয়া নীরবে শুনিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সহসা সে বলিল—সবিতা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো—উত্তর দেবে?

সবিতা বই হইতে চোখ তুলিয়া অসীমের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—কি কথা?

অসীম একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—এই যে দিনের পর দিন, নিরলসভাবে তুমি আমাকে সেবা করছো, এতে তোমার কি কষ্ট বা বিরক্তি কিছুই হয় না—?

সবিতা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে অসীমের দিকে চাহিয়া কহিল.—রোগীর সেবা করতে আবার কষ্ট বা বিরক্তি হবে কেন? কি যে তুমি বল—!

অসীম একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—শুধু রোগীর সেবা,—তার বেশী কিছু নয়! আমি যদি অপরিচিত রাস্তার লোক হতাম, তা হলেও তুমি বোধ হয়, ঠিক এই রকমই সেবা করতে—? তুমি দেবী—তুমি তা পার—

অসীমের কথার শেষে একটা গূঢ় অভিমানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—দেবী হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নেই, আর তোমাকে অপরিচিত রাস্তার লোকও মনে করতে পারি নে। অসীমদা, তুমি অতীতকে সহজেই ভুলে যেতে পার, কিন্তু আমি তো পারি নে—

তারপর একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—তোমার মনে নাই, —ছেলেবেলায় একবার আমার কঠিন রোগ হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না, তোমার অক্লান্ত সেবার গুণেই সেবার বেঁচে উঠেছিলাম—

অসীম প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে বলিল,—সেই ঋণ তুমি এতদিন পরে পরিশোধ করছ, তোমার কৃতজ্ঞতা আছে বটে—!

সবিতার মুখ বেদনায় নীল হইয়া উঠিল, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। ব্যথিত কণ্ঠে সে শুধু বলিল,—অসীমদা—!

অসীম সবিতার দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া তাড়াতাড়ি তাহার একখানি হাত ধরিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল,—তুমি রাগ করলে সবিতা ?—কি যে ছাইপাঁশ বলি, অনেক সময় নিজেও বুঝতে পারি না।······সত্যই সময় সময় আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, মানুষ এত সেবা করতে পারে কেমন করে! আমার মত একজন দরিদ্র ভবঘুরে—তার জন্য—

সবিতা উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, অসীম তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—আমার জন্য সেদিন আর একটী জীবন আহুতি পড়লো—অফুটন্ত পুষ্পকোরক অকালে ঝরে গেল—! উঃ! এ দুঃখ আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না—

সবিতা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল,—তুমি দেবীর কথা বলছিলে, দেবী সেই অসীম-দা,—বালিকা হলেও সে আমার নমস্যা—

—কত বড় হৃদয় নিয়ে সে জন্মেছিল—কিন্তু মানুষের হিংস্র বর্ব্বরতা, অকালে তাকে পদদলিত ক'রল—

সবিতা মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিল,—

যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে,
যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা,
হয়নি প্রভু তারা হয়নি সারা—

কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব হইয়া রহিল। একটু পরে অসীম

উঠিয়া বসিয়া বলিল,—সবিতা আজ আমাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে?—সেই নদীর ধারে—যেখানে তার শেষস্মৃতি তারা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছে—!

সবিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—এতখানি পথ কি তুমি চলে যেতে পারবে,—অসীম-দা—?

অসীম ম্লান হাসিয়া বলিল,—তুমি আমাকে ধরে নিয়ে যাবে—

সবিতা একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বেশ, চল—!

দুইজনে আশ্রম হইতে বাহির হইল। বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে, সূর্য্যরশ্মির তেজ কমিয়া গিয়াছে। অসীম সবিতার বাহুর উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে চলিতে লাগিল। পথের দুই ধারে শ্রমিকদের বাড়ী,—শান্ত নিস্তব্ধ—তাহারা অনেকেই এখনো কারখানা হইতে ফিরে নাই। কেবল স্থানে স্থানে ছেলেমেয়েরা মিলিয়া চীৎকার ও ছুটাছুটি করিতেছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বেই এই বস্তীর উপর দিয়া যে ভূমিকম্প চলিয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র এখন আর নাই!

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অসীম ও সবিতা গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল।

সবিতা কহিল,—এইটুকু পথ আসতেই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এস এইখানে একটু বসি।

দুইজনে পাশাপাশি গঙ্গার ধারে উপবেশন করিল। সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা, তাহার জলকণাবাহী বাতাস আসিয়া দুইজনের শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দিল। মৃদু তরঙ্গমালার উপরে সূর্য্যাস্তের শেষ

রশ্মি,—যেন কে তাহার উপর সিন্দুর ছড়াইয়া দিয়াছে! চারিদিকে একটা মৌনগম্ভীর শান্তি সন্ধ্যার আগমন সূচনা করিতেছে। নদীবক্ষে দুই একখানা নৌকা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে—মাঝির মুখে ভাটিয়ালী গান, কোন অজানা বিরহিনীর নিগূঢ় বেদনা ব্যক্ত করিতেছে!

সবিতা কিছুক্ষণ পরে কহিল,—এইখানেই তারা শান্তির চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়েছিল—

—এস্থান আমার কাছে পবিত্র তীর্থ, আত্মোৎসর্গের পবিত্র স্মৃতি এর আকাশে বাতাসে মিশ্রিত আছে—!

এই বলিয়া অসীম ভূমিতলে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। সবিতাও প্রণাম করিয়া বলিল,—সেই ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয়ে যে অনন্ত প্রেম ছিল, তার এককণাও যদি পেতাম, ধন্য হয়ে যেতাম—!

সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তরাগ সেই সময়ে সবিতার মুখের উপরে পড়িয়া তাহাকে অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত করিল। অসীম কয়েক মুহূর্ত্ত সবিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার এক হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল—

—শোন সবিতা, শান্তির শ্মশানে বসে আজ সঙ্কল্প করছি, যাদের জন্য সে অকালে আত্মাহুতি দিয়েছে, তাদেরই সেবায় জীবন উৎসর্গ করবো,—সেই অর্দ্ধনর অর্দ্ধপশুদের মানুষ করবার সাধনাই আমার কাজ। আজ থেকে দারিদ্র্যই আমার ভূষণ, দুঃখই আমার ঐশ্বর্য্য, ত্যাগই আমার ব্রত। তুমি কি এই দুঃসাধ্য ব্রতে আমার সঙ্গিনী হবে, সবিতা—?

সবিতা মুখে কোন কথা বলিল না, শুধু অসীমের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ মধুর হাসিল,—সেই হাসির মধ্য দিয়াই বুঝি তার সমস্ত উত্তর ব্যক্ত হইয়া উঠিল !

দূরে অস্তগামী সূর্য্য গঙ্গাতরঙ্গে দুলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল।